NATIONAL LIBRARY
Imp. 3902
27/8/09
CALCUTTA

বামাবোধিনী পত্রিকা।

June, 1908

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৬ বর্ষ। ৫৩৮ সংখ্যা। { জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫। জুন, ১৯০৮। } ৯ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

উপাধি লাভ—ভারত-সচিব জন্ মর্লি, ভাইকাউণ্ট মর্লি অব ব্লাকবরন উপাধি গ্রহণ করিয়া লর্ড সভায় প্রবেশ করিয়াছেন।

ফাঁসী—পোর্টুগালের রাজাকে হত্যা করার অপরাধে অনেকগুলি লোক ধৃত হইয়াছিল। নূতন রাজা হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর সকলের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছেন।

মৃত্যু—সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, কলিকাতা সেণ্টজেবিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক ফাদার লাফোঁ গত ১০ই মে দার্জ্জিলিংএ মানব-লীলা সংবরণ করিয়াছেন। বিজ্ঞানশাস্ত্রে [illegible]য় পণ্ডিত ছিলেন এবং [illegible]ক অতি যত্নের সহিত [illegible]

[illegible]লম লীগ—[illegible] বিচার [illegible]

বিলাতে উক্ত ভারতীয় মুসলমান সমিতির একটী শাখা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোন সম্প্রদায় বা দলবিশেষের উদ্দেশ্য সাধন ইহার অভিপ্রায় না হইয়া সম্মিলিত ভারতের উন্নতিসাধনই এই সভার উদ্দেশ্য।

পুনার মাদকনিবারিণী সভা—পুনার মাদকনিবারিণী সভার উদ্যোগে তত্রত্য কতিপয় যুবক মাদক সেবন নিবারণের জন্য সদর রাস্তার লোকের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া মদ্যপায়ীদিগকে মদ্যপানে বিরত করিবার চেষ্টায় অপরাধে তত্রত্য ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে দণ্ডিত হয়। এ বিষয় আলোচনা করিবার জন্য ডাক্তার ভাণ্ডারকারের সভাপতিত্বে এক সভা করিয়া তত্রত্য অধিবাসীরা তাঁহাদের পক্ষ হইতে লাটসাহেবের নিকট ডিপুটেশন পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

RARE BOOK

বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফল—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এফ এ পরীক্ষায় এ বৎসর ১০৫৮ জন ছাত্র পাশ হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম বিভাগে ৯৩, দ্বিতীয় বিভাগে ৪৭১ ও তৃতীয় বিভাগে ৪৯৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। নিম্নলিখিত বালিকাগুলি গুণানুসারে বি, এ, এফ, এ ও এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

বি, এ, পরীক্ষার ফল।

পাস কোর্স।

রমা ভট্টাচার্য্য বেথুন কলেজ।
জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় " "
প্রতিভা গুহ " "
বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায় " "
বনলতা দে প্রাইভেট।
সুষমা মৈত্র "
নীরোদবাসিনী সোম "

এফ্ এ পরীক্ষার ফল।

প্রথম বিভাগ।

সত্যপ্রিয়া ঘোষ—বেথুন কলেজ।
জ্যোতির্ম্ময়ী দত্ত— " "

দ্বিতীয় বিভাগ।

শিশির কুমারী গুহ—বেথুন কলেজ।
মার্গারেট লাবণ্যলতা লভ—প্রাইভেট।
বাসন্তী মামগাইন—বেথুন কলেজ।
বিভা রায়— " "
শৈলবালা সমদ্দার— " "
মৃণালিনী সরকার— " "

তৃতীয় বিভাগ।

কিরণ কুমারী বসু—বেথুন কলেজ।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ফল।

১ম বিভাগ।

নির্ম্মলা রায় বেথুন কলেজ।
সুশীলা সেন এডেন ফিমেল স্কুল, ঢাকা।

২য় বিভাগ।

স্নেহনলিনী বসু বেথুন কলেজ।
অমলা দাস " "
সুবর্ণপ্রভা দত্ত " "
প্রীতিবালা ঘোষাল " "
লীলালতিকা মুখার্জি " "
ললিতা রায় " "
শৈলজা চৌধুরী এডেন ফিমেল স্কুল, ঢাকা।
কনসিডিনী এনাই লোরেটো হাউস।
সেওদাত অহজিন " "
বিদ্যুৎপ্রভা দত্ত নর্ম্মাল স্কুল।
মাধুরী বালা ঘোষ ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়।
সোফিয়া হোরাজি সোম " "
স্নেহলতা মল্লিক এ, গার্লস এচ্ ময়মনসিংহ।

তৃতীয় বিভাগ।

ললিতা বসু প্রাইভেট।
ইন্দুপ্রভা ভট্টাচার্য্য ডায়োশিশন মিসন।
সুশীলাবালা বাগ্‌চী " "
সুরমা বিশ্বাস " "
সুষমা বিশ্বাস " "
সরোজিনী দত্ত শিক্ষয়িত্রী ক্যাল
কমলা দে চট্টগ্রাম
শৈলজা দে শিলচ
জ্ঞানপ্রিয়া ঘোষ
প্রেমপ্রভা নি
চেম্বার্স

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ।
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

वर्ग संख्या
Class No. বঙ্গবাণিনী পত্রিকা
জ্যৈষ্ঠ, অগ্রহায়ণ, পৌষ,
পুस्तक संख्या
Book No. মাঘ - চৈত্র, ১৩১৩
ভাদ্র, বিজয়া, ১৩০৮ -
रा० पु०/N. L. 38. শ্রাবণ-চৈত্র, ১৩০৯

H7/Dte/NL/Cal/79—2,50,000—1-3-82—GIPG.

ভক্তকবি তুলসীদাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

সকলি সাধনাসাপেক্ষ। জগদীশ্বর মনুষ্য-মধ্যে এমন সকল উপাদান দান করিয়াছেন যে, সাধনাদ্বারা সে সকল অদ্ভুত উৎকর্ষ ও অদ্ভুত শক্তি লাভ করে (১)। তুলসীর কঠোর সাধনার বিষয় ভাবিলে চমকিত হইতে হয়। তিনি অশ্রান্ত অভ্যাস-বলে বাত-বর্ষ, শীতাতপ, আহার-নিদ্রা, শ্রান্তি, অবসাদ, সুখ-দুঃখ সকলি জয় করিয়াছিলেন। দুরারোহ হিমগিরি হইতে সিংহল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র তাঁহার গতি অপ্রতিহত ছিল। নানা-বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য, তিনি পদব্রজে সুদুর্গম স্থান সকলে অনায়াসে গমন করিতেন। গন্তব্য স্থান যত দূরে থাকুক, তথায় না পঁহুছিয়া বিশ্রাম করিতেন না। চিত্রকূট, কাশীধাম ও অযোধ্যা এই তিনটী স্থান তাঁহার প্রিয়তম সাধনাক্ষেত্র। চিত্রকূটে তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। তুলসীদাসের তিরোধানের পর হইতে ঐ চিত্রকূট রামভক্ত যোগী, সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণবগণের মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। সীতা-রাম-হনুমান্-মূর্ত্তির সঙ্গে অসংখ্য তুলসীমূর্ত্তি চিত্রকূটের গাত্রে গাত্রে, গুহায় গুহায় বিরাজমান। তথায় তুলসীর নামে স্থাপিত অসংখ্য মঠ বিদ্যমান। প্রত্যহ বহুতর সাধু, সন্ন্যাসী, অতিথি, অভ্যাগত, দীন-দরিদ্রেরা ঐ সকল মঠে আহার ও আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে।

তুলসীদাস পরোপকারের সুযোগ পাইলে ছাড়িতেন না। তাঁহার প্রভাব এরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল যে, কি উচ্চ, কি নীচ, রাজা, প্রজা, সকলেই নতশীর্ষে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিত। তিনি স্বয়ং নিঃস্পৃহ হইলেও, লোকের বিপদমোচন বা অন্যবিধ সৎকর্ম্মের জন্য সময়ে সময়ে ধনিগণকে অনুরোধ করিতেন। কাশীধামে টোডরমল্ল নামে একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার ছিলেন। বড় বড় চারিখানি গ্রাম তাঁহার অধিকার-ভুক্ত ছিল। তিনি জিতেন্দ্রিয়, সদাশয় ও পরোপকারী। কোনও দুরাত্মা খড়্গাঘাতে তাঁহার প্রাণসংহার করে। তুলসী এই সংবাদ পাইয়া কহিলেন ;—

"চার গাংবকো ঠাকুরো, মনকো মহা-
মহীপ।
তুলসী যা কলিকালমেং, অপরে টোডর-
দীপ॥"

অর্থাৎ—টোডর, চারি গ্রামের অধিকারী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি মনোরাজ্যের

(১) কাশীর সুবিখ্যাত যোগী তৈলঙ্গস্বামীকে অনেকে দেখিয়াছেন, এবং অনেকে তাঁহার কথা শুনিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি এবং তাঁহার কয়েকটী অদ্ভুত কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কয়েক বৎসর গত হইল, তিনি তিরোধান করিয়াছেন। কাশীতে বাঙ্গালা-ভাষায় ও হিন্দিভাষায় তাঁহার জীবনচরিত মুদ্রিত হইয়াছে। পাঠকেরা ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারেন।

মহিমান্বিত রাজা ছিলেন। আজি এই তামসযুগে টোডররূপদীপটী নির্ব্বাণ হইল?

টোডরের মৃত্যুর পর, তাঁহার দুই পুত্র রাধাইরাম ও আনন্দরাম পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি লইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তুলসীর আজ্ঞামাত্র তাঁহারা ভ্রাতৃবিরোধ ছাড়িয়া পরম প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। তৎকালে কাশী অঞ্চলে খানখানা নামে এক মহাপ্রভাব ব্যক্তি ছিলেন। খানখানা ধনশালী মুসলমান। আরবি ও ফারসি ভাষায় তিনি মহাকবি। এক দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া তুলসীর শরণাপন্ন হইল। তুলসী নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধ লিখিয়া সেই দরিদ্রকে দিয়া খানখানার নিকট প্রেরণ করিলেন, শ্লোকার্দ্ধ যথা ;—

"সুরতিয় নরতিয় নাগতিয় সব চাহত
আসহোয়।

—অর্থাৎ সুরলোকের, নরলোকের ও নাগলোকের সকল নারীই পতিসহবাস কামনা করে।

খানখানা ঐ শ্লোকার্দ্ধ পড়িয়া সেই দরিদ্রের কন্যাবিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিলেন এবং তুলসীর সেই শ্লোকার্দ্ধ এইরূপে পূরণ করিয়া তুলসীর নিকট পাঠাইলেন ;—

"গর্ভ লিয়ে হুলসী ফিরে, সোংস্থত হোয়॥"

অর্থাৎ—"তাহারা মহোল্লাসে এই জন্য পতি কামনা করে যে,—আমাদের গর্ভে যেন তুলসীর ন্যায় সুসন্তান জন্মগ্রহণ করে।"

কথা সত্য ; "একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি"—একটী কুলচন্দ্র সুসন্তান দ্বারা সমস্ত মানবসমাজ আলোকিত হয়।

একদা কোনও পণ্ডিত, নায়কনায়িকাঘটিত অশ্লীলরসের একখানি কাব্য সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া তুলসীকে উপহার দিয়া কহিলেন —গোসাইজি! আপনি পণ্ডিত হইয়া অগ্রাহ্য প্রাকৃতভাষায় (দেশী হিন্দিভাষায়) গ্রন্থ লেখেন কেন? তুলসী তদুত্তরে তৎক্ষণাৎ এই দোঁহা রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইলেন ;—

"মণিভাজন বিষ পাবই, পূরণ অমী নিহারী।
কা ছাড়িয়, কা সংগ্রহিয়, কহহু বিবেক
বিচারি॥
কা ভাষা কা সংস্কৃত প্রেম চাহিয়ে সাংচ।
কাম জো আবৈ কামরী, কা লে ফরৈ
কমাচ॥"

অর্থাৎ—বিষপূর্ণ মণিময় পাত্র এবং অমৃতপূর্ণ মৃণ্ময় পাত্র, এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টী গ্রাহ্য এবং কোন্‌টী অগ্রাহ্য, তাহা বিবেকশক্তি দ্বারা বিচার করিয়া দেখা উচিত। দেশীভাষাই কি, আর সংস্কৃতভাষাই কি, বিশুদ্ধ প্রেমপদার্থ চাই। যদি কম্বলে শীত নিবারণ হয়, তবে সোণার জামায় কি প্রয়োজন? (১)।

(১) তুলসীর রামায়ণাদি কাব্য, দোঁহাবলী ও অন্যান্য প্রবন্ধসকল যদি হিন্দিভাষায় রচিত না হইয়া সংস্কৃতভাষায় রচিত হইত, তবে ভারতের অধিকাংশ লোকই ঐ সকলের রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিত। দেশীভাষায় রচিত বলিয়াই সর্ব্বসাধারণে উহার পাঠে ও অর্থগ্রহণে সমর্থ। গৃহে, হাটে, মাঠে, পথে, ঘাটে, দোকানে, ইতর, ভদ্র

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে,—অযোধ্যা, কাশী ও চিত্রকূট তুলসীর প্রিয়তম স্থান। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পান্থশালা, অতিথিশালা, মঠমন্দিরাদি নানাস্থানে বিকীর্ণ হইলেও, ঐ তিন স্থান তাঁহার প্রধান কীর্ত্তিস্থান। যাত্রীরা কাশীধামে গিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চারিটী স্থান পরম তীর্থজ্ঞানে দর্শন করিয়া থাকে। ১ম,—অসীর নিকট 'তুলসী ঘাট', তথায় মন্দিরমধ্যে তুলসীর স্থাপিত হনুমান্-মূর্ত্তি বিদ্যমান। মন্দিরের বহির্গাত্রে একটী মন্ত্র খোদিত আছে, উহা 'বীসাযন্ত্র' নামে খ্যাত। কথিত আছে, তুলসীদাস স্বহস্তে ঐ মন্ত্র খোদিত করিয়াছেন। এইরূপ প্রসিদ্ধি যে, ঐ বীসাযন্ত্রের মন্ত্রাক্ষরগুলি ভূর্জ্জাদি পত্রে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া, তাহা কবচ বা মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে শিশুগণের অসাধ্য রোগের শান্তি হয়। ঐ মন্দিরের পার্শ্বেই তুলসী-গুফা। তুলসী অন্তিমকালে ঐ গুফায় ছিলেন। ২য়—শ্রীমুকুন্দরায়ের বাগিচার পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে, গোপালমন্দিরের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র গৃহ; উহা তুলসীর বৈটকখানা ছিল। ঐ গৃহ সর্ব্বদা বন্ধ থাকে, কেবল প্রতিবর্ষে শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে ঐ গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হয়। সকলে জানালার ফাঁক দিয়া ঐ গৃহের অভ্যন্তর দেখিয়া থাকে। কথিত আছে,—তিনি ঐ গৃহে বসিয়া "বিনয়-পত্রিকা" নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ৩য়,—'প্রহ্লাদঘাট'। ৪র্থ,—'সঙ্কটমোচন' নামক বিখ্যাত হনুমান্-মূর্ত্তি; ইহা অসীনালার উপর স্থাপিত। লোকে সঙ্কটে পড়িয়া ঐ মূর্ত্তির পূজা করে এবং ঐ স্থানে ধন্না দিয়া পড়িয়া থাকে। কথিত আছে,—গঙ্গারামজী নামে এক জ্যোতিষী একদা কাশীরাজের নিকট বহু অর্থ পাইয়া তুলসীর চরণে অর্পণ করেন। তুলসীর আজ্ঞায় তিনি সেই অর্থে অসীর উপর বারটী হনুমান্-মূর্ত্তি স্থাপিত করেন; তন্মধ্যে এক্ষণে একটী মাত্র বিদ্যমান। অসীর ঘাটে মহাসমারোহে তুলসীর রামলীলা মহোৎসব হইত। উক্ত রামলীলার "লঙ্কা" নামক স্থানটী অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে। তিনি ঐস্থানে কৃষ্ণলীলা মহোৎসবও করিতেন, উহাও অদ্যাপি প্রসিদ্ধ।

অসীঘাট তুলসীর প্রিয় বাসস্থান ছিল। ঐ স্থান অতি রমণীয়, জনতাশূন্য ও পরিষ্কৃত। ঐ স্থানে কাশীনরেশের উদ্যান, বৈটকখানা বাটী ও ভূগর্ভে বিশাল হোমশালা নির্ম্মিত আছে। ঐ স্থানের গঙ্গাজল স্বচ্ছ কাচের ন্যায় নির্ম্মল ও মধুর।

অনেকেই দৈনিক কার্য্যাবসানে সন্ধ্যার পর সমবেত হইয়া, তুলসীর গ্রন্থসকল ভক্তিভাবে পাঠ ও শ্রবণ করে। ইহা দ্বারা তাহাদের মনে ধর্ম্মভাব জাগ্রত থাকে, সাংসারিক কর্ত্তব্যবিষয়েও তাহারা অশেষ জ্ঞানলাভ করে। সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত, শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতির অধ্যয়নে ও মর্ম্মগ্রহণে কয় জন সমর্থ? তুলসী সংস্কৃতভাষায় যে কয়েকটী স্তোত্র ও মঙ্গলাচরণ লিখিয়াছেন, তাহা পড়িলে নিশ্চয় প্রতীতি হয় যে, তিনি বিশুদ্ধ ও সুললিত সংস্কৃত পদাবলীর রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন; কেবল সর্ব্বসাধারণের হিতার্থেই দেশীভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

জ্ঞান হয় যেন তুলসী হৃদয়ের শান্তি ও পবিত্রতা ঐ স্থানে জীবন্তভাবে বিদ্যমান। কাশীর একপ্রান্ত বরুণানদী, অপর প্রান্ত অসীনদী। ঐ দুই নদীর নামে কাশীর নাম 'বারাণসী' হইয়াছে। এক্ষণে ঐ দুই নদী শুষ্কপ্রায়। একদা তুলসীদাস অযোধ্যাপুরী ধ্যান করিতে করিতে অসীঘাটে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ডুবিয়া জলমধ্য দিয়াই তিনি অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। যে স্থানে উঠিলেন, উহা গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমস্থান। তিনি উঠিয়া তত্রত্য লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ কোন্ ঘাট? এ স্থানের ও এ স্থানের রাজার নাম কি? লোকেরা কহিল,—ইহা অযোধ্যার রামঘাট, এস্থানের রাজার নাম রামসিংহ এবং এ নগরের নাম রামপুর। বারংবার রামনাম শ্রবণ করিয়া তুলসীর প্রেমাশ্রু ঝরিতে লাগিল। লোকেরা কহিল,—এ স্থানে আসিলে রাজাকে কর দিতে হয়। তুলসী কাতরভাবে কহিলেন,—আমি দরিদ্র, অর্থ কোথা পাইব?

এদিকে তুলসীর আগমনবার্ত্তা নগরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। রাজা রামসিংহ তুলসীপ্রভুর শুভাগমন শ্রবণে পুলকিত হইয়া স্বয়ং পদব্রজে আসিয়া তদীয় চরণে পতিত হইলেন। রাজা করযোড়ে কহিলেন,—প্রভো! যদি কৃপা করিয়া এ দাসকে পদধূলি দিলেন, তবে এ শরণাগতকে আপনার শিষ্য করুন। আপনার শুভাগমন উপলক্ষ্যে আজি নগরের সমস্ত দীন-দুঃখী, সাধু-সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে অন্নবস্ত্র দান করা হউক। অনন্তর তুলসীর সম্মতিক্রমে রাজা তাঁহার নিকট যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, নগরে মহোৎসব হইতে লাগিল। তদবধি ঐ দেশের সমস্ত অধিবাসী রামভক্ত হইল। রাজা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে গুরুদেবের চরণপাদুকা (খড়ম) স্থাপন করিলেন। তিনি অন্তিমকাল পর্য্যন্ত ঐ গুরুপাদুকা পূজা করিয়াছিলেন।

হরিপ্রাণা মীরাবাই (১) সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ

(১) মীরাবাই মত্তানামক দেশের রাজকন্যা, উদয়পুরের মহারাণার পত্নী। শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার অহেতুকী ভক্তি ছিল। তাঁহার স্বামী, শ্বশ্রূ প্রভৃতি বৈষ্ণবদ্বেষী শাক্ত। কৃষ্ণভক্তা মীরার উপর তদীয় স্বামী ও শ্বশ্রূ ঘোরতর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। মীরা অম্লান মুখে সকলি সহ্য করিতে লাগিলেন, কিছুতেই সাধনা হইতে বিচলিতা হইলেন না। শ্বশ্রূ মীরার সংহারের জন্য তদীয় চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিলেন। কথিত আছে, স্বীয় চরিত্রের বিশুদ্ধতা সপ্রমাণ করিবার জন্য মীরা পতিদত্ত বিষপানেও মরেন নাই। মহারাণা কুপিত হইয়া মীরাকে খড়্গাঘাত করিলেন; কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হইল, মীরা অক্ষতদেহে রহিলেন। শেষে মহারাণা মীরাকে ধর্ম্মসাধনাবিষয়ে স্বাধীনতা দান করায়, মীরা নানা তীর্থ ভ্রমণপূর্ব্বক বৃন্দাবনে বাস করিয়া গভীর সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রেমপূর্ণ ভগবৎসঙ্গীতে পশুপক্ষীরাও মুগ্ধ হইত। কথিত আছে,—আকবর বাদসাহ নিজ সঙ্গীতাচার্য্য তানসেনের সহিত বৃন্দাবনে গিয়া মীরার সঙ্গীতশ্রবণে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতা ভাবিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। উদয়পুরে ও অন্যান্য স্থানে মীরার প্রতিষ্ঠিত মঠমন্দিরাদি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এইরূপ প্রবাদ যে, মীরা স্বীয়

করিয়া, হরিভজনেই নিযুক্তা থাকিতেন। ইহাতে তাঁহার স্বামী, শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। মীরা অতিমাত্র নিগৃহীতা হইয়া, তুলসীদাসকে পত্র লিখিয়া মর্ম্মবেদনা জানাইলেন। লিখিলেন যে,—আমার স্বামী প্রভৃতি পরমাত্মীয়েরাই আমার সাধনাপথে গুরুতর বিঘ্ন ঘটাইতেছেন। এখন আমি কি করি? তুলসীদাস তদুত্তরে মীরাকে নিম্নলিখিত ভজনগাথা লিখিয়া পাঠান ;—

"জিনকে প্রিয় ন রাম বৈদেহী।
তজিয়ে তিহেঁং কোটি বৈরীসম যদ্যপি
পরমসনেহী॥
তজ্যো পিতা প্রহ্লাদ বিভীষণ ভরত বংধু
মহতারী।
গুরু বলি তজ্যো কংত ব্রজবনিতন ভয়ে
সব মংগলকারী॥
নাতো নেহ রামকো মানিয়া সুহৃদ
সুসেব্য জহাংলোং।
অংজন কৌন আংখ জো ফুটৈ বহুতৈ—
কহোং কহাং লোং॥
তুলসি সোই সব ভাংতি আপনো পূজ্য
প্রাণতে প্যারো।
জাতে হোয় সনেহ রামসোং সোঈ মত
হমারো॥"

এই ভজনগাথার অর্থ এই যে,—"যাঁহাদের ভগবানে প্রীতি নাই, তাঁহারা তোমার পরম স্নেহবান্ আত্মীয় হইলেও, কোটি-শত্রু-সম পরিত্যাজ্য। দেখ!—প্রহ্লাদ হরিভক্তিবিমুখ পিতাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। বিভীষণ রামবৈরী জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। ভরত রামদ্বেষিণী জননীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। বলিরাজ হরিবিরোধী গুরুকে ত্যাগ করিয়াছিলেন (১)। কৃষ্ণপ্রাণা গোপিকারা পতি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্যাগী হইয়া ভগবানেই প্রেম নিবদ্ধ করা চাই। যাহাতে জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়, সেই অঞ্জনই সেবনীয়; যদ্দ্বারা জ্ঞান-নেত্র বিনষ্ট হয়, তাহা বিধবৎ পরিহার্য্য। সার কথা এই যে,—যাঁহার উপদেশে ঈশ্বরে পরানুরক্তি জন্মে, তিনিই আমার পূজ্য ও প্রাণাধিক প্রিয়তম!"

তুলসীর এই কথাগুলি ভগবৎসাধনার পক্ষে সার সত্য। 'বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য' না হইলে, অর্থাৎ মনকে সমস্ত বিষয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া ভগবানে সংলগ্ন

ভৌতিক দেহের তিরোধান জন্য স্বপ্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সমীপে পাষাণভেদী কাতরস্বরে প্রার্থনা করায়, ঐ মূর্ত্তি মুখব্যাদন করিলেন, এবং মীরা ঝম্প দিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্তর্ধান করিলেন। এই অদ্ভুত ঘটনার স্মরণার্থে উদয়পুরে মীরার ও তদীয় ইষ্ট দেবতার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, এবং অদ্যাপি ঐ দুই মূর্ত্তির পূজা যথাবিধি হইয়া থাকে। তুলসীর ন্যায় মীরারও রচিত হিন্দি ভজনগাথা সকল প্রসিদ্ধ। মীরা তুলসীদাসকে ইষ্টগুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন।

(১) বলিরাজের গুরু শুক্রাচার্য্য বামনরূপী হরিকে অঙ্গীকৃত ত্রিপাদভূমিদানে নিষেধ করেন ও বাধা উৎপাদন করেন, কিন্তু বলিরাজ গুরুর সে নিষেধ মানেন নাই।

করিতে না পারিলে, ভগবৎসাধনা হয় না, সে ব্রহ্মানন্দ-ভোগে অধিকার জন্মে না।

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব ! ॥"

"তুমিই মাতা, তুমিই পিতা; ভাই, বন্ধু আত্মীয়, স্বজন তুমিই; আমার বিদ্যা-বুদ্ধি বিষয়-বিভব সকলি তুমি। হে দেবদেব! তুমি আমার সকলি।"

এইরূপে সাধকের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের একটানা স্রোত সেই প্রেমসাগরের দিকে প্রবর্ত্তিত হইলে, তবে ভগবৎসাধনা হয়। সর্ব্বত্যাগিনী গোপবালারা এইরূপ সাধনা করিয়াছিল। তাহাদের সুখ-দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সকলি শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত। শুকদেব-সদৃশ মদীয় ৺ পিতৃদেবের একটী গান এস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। গানটী এই—

(উদ্ধবের প্রতি গোপিকাদের উক্তি।)

("মোরা) কৃষ্ণসুখে সুখী ব্রজাঙ্গনা।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ না করি সাধনা।
শুন ওরে উদ্ধব! আমরা গোপিকা সব
শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-রস করিছে কামনা!"

হে উদ্ধব! তিনি আমাদের সুখ-দুঃখের সংবাদ জানিতে চাহিয়াছেন। তিনি অন্তঃসাক্ষী, সকলি জানেন, তথাপি তাঁহাকে বলিও,—তাঁহার এ দাসীরা তাঁহার সুখেই সুখী। তিনি স্বয়ং উপযাচক হইয়া আমাদের হাতে হাতে চতুর্ব্বর্গ দান করিলেও, আমরা তাহা লই না। আমাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, তাঁহারি প্রীতি। আমরা সেই মধুক্রমের মাধুর্য্য-রসেরই ভিখারিণী। আমাদের পাপের ফল ও পুণ্যের ফল—তাঁহার বিরহ ও সম্মিলন।

কয়েকটী গোপবালার এইরূপে মোক্ষলাভ হইয়াছিল;—

"তদপ্রাপ্তিমহাদুঃখবিলীনাশেষপাতকা।
তচ্চিন্তাবিপুলাহ্লাদক্ষীণপুণ্যচয়া তথা।
চিন্তয়ন্তী জগৎসূতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্।
নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গতাস্তা গোপ-
কন্যকা ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ)

ভোগেই কর্ম্মফলের ক্ষয় হয়। "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি"—বিনা ভোগে শতকোটি কল্পেও কর্ম্মফলের ক্ষয় হয় না। পাপ পুণ্য নির্ম্মূল না হইলে মুক্তিলাভ সম্ভাবিত নহে। ফলের একটু বীজ অবশিষ্ট থাকিলে, তাহা আবার অঙ্কুরিত এবং ক্রমে পল্লবিত ও ফলিত হয়। এজন্য বীজের ধ্বংস করা চাই। কয়েকটী গোপিকার কৃষ্ণবিরহ-সন্তাপ এত সুতীব্র হইয়াছিল যে, তাহাতেই তাহাদের সমস্ত পাপফল দগ্ধ হইয়া গেল। আবার কৃষ্ণচিন্তাজনিত আনন্দ তাহাদের হৃদয়ে এত বিপুল, এত গভীর ও এত প্রগাঢ় যে, তাহাতেই তাহাদের সমস্ত পুণ্যফল নিঃশেষিত হইল। তাহারা কান্তভাবে ধ্যান করিলেও সেই পরম-ব্রহ্মকেই ধ্যান করিতেছিল। সেই অবস্থায় যখন তাহাদের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের স্রোত নিরুদ্ধ হইয়া গেল, তখনি তাহারা মুক্তিলাভ

করিল। সাধনা যত গভীর হয়, সিদ্ধিও তত সন্নিহিত হয়। হৃদয়ে সে প্রেম-হুতাশন প্রজ্বলিত হইলে, দাবানলে তৃণ-রাশির ন্যায় অশেষ বাসনারাশি ভস্মীভূত হয়। ভক্তবৎসল নারায়ণ স্বয়ং প্রহ্লাদের সমীপে আবির্ভূত হইয়া বরদানে উদ্যত হইলে, প্রহ্লাদ বলিলেন,—

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥
নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥
ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিংতস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি॥"
(বিষ্ণুপুরাণ)।

—সন্নিপাত-বিকারের তৃষ্ণার মতন,
বিষয়ে যেরূপ তৃষ্ণা করে মূঢ়গণ,
সেইরূপ তৃষ্ণা মোর যেন দয়াময়!
হরি হে! তোমারি পদে চিরকাল রয়।
সহস্র সহস্র যোনি করিব ভ্রমণ,
হে নাথ! তাহাতে কষ্ট না করি গণন;
কিন্তু হরি! যে যোনিতে পড়িব যখন,
তোমাতে একান্তভাবে থাকে যেন মন।
অখিল বিশ্বের মূল তুমি ভগবান্,
তোমাতেই আত্মা যেই করে সমাধান;
হস্তেই তাহার মোক্ষ থাকে অনুক্ষণ,
ধর্ম্ম-অর্থ-কামে তার কিবা প্রয়োজন?

অহহ! প্রহ্লাদ! তুমিই ভগবান্‌কে ডাকিতে জান, এবং সেই প্রাণারামের নিকট কোন বস্তু চাহিতে হয়, তাহাও জান। আমরা সমুদ্রের বহিশ্চর শফরায়ণী মৎস্যরত্ন (১)। রত্নাকরের গভীর গর্ভে কি রত্ন নিহিত আছে, কিরূপে জানিব? সাধনা চাই। যদি বল,—সে সাধনা কি সহজ কথা, সে যে অসাধ্য সাধন। সাধ্য কি অসাধ্য, তাহাই বা দেখিলাম কৈ? "পরিবার পরিবার" "অর্থ অর্থ" করিয়া যাহা করিলাম, তাহা যদি ঈশ্বরসাধনায় নিয়োজিত করিতাম, আজি শেষবয়সে এ দারুণ যাতনায় চিৎকার ছাড়িতে হইত না। কার্ডিন্যাল উল্‌জি, ইংলণ্ডেশ্বর অষ্টম হেনিরির প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি একান্তভাবে অবিশ্রান্ত রাজসেবায় প্রাণ-পাত করিয়াছিলেন। শেষে সেই রাজাই যখন তাঁহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন, তখন বৃদ্ধ উল্‌জি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"If I had served God as diligently as I have served the king, He would not have given me over in my grey hairs."—যেরূপ একান্তভাবে আমি রাজসেবা করিলাম, সেইরূপে যদি ঈশ্বরসেবা করিতাম, এ বৃদ্ধ দশায় ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ করিতেন না।

অবিবেকী মানবের শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিয়াই দয়াসিন্ধু মহাত্মারা নানা প্রকারে মানবের চৈতন্যসম্পাদনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের কল্যাণপ্রদ উপদেশে অনাস্থা করিয়াই আমরা যাতনা-যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইতেছি। আমাদের

(১) মৎস্যরত্ন—মাছরাঙা পাখী। শফরান্বেষী—যে চুণাপুঁটি খুঁজিয়া বেড়ায়। মাছরাঙা জলের উপর চুণাপুঁটি ধরিয়া বেড়ায়।

পরিণামকে ঘোর বিভীষিকাময় করিতেছি। একজন কবি বলিতেছেন ;—

অর্থাঃ পাদরজোপমা গিরিনদীবেগোপমং যৌবনং ;
মানুষ্যং জললোলবিন্দুচপলং ফেনোপমং জীবনম্।
ধর্ম্মং যো ন করোতি নিশ্চলমতিঃ স্বর্গার্গলোদ্ঘাটনং ;
পশ্চাত্তাপহতো জরাপরিণতো শোকাগ্নিনা দহ্যতে ॥

—পায়ের ধূলার ন্যায় বিভব সকল,
নদীর স্রোতের ন্যায় যৌবন চঞ্চল ;
ক্ষণিক মনুষ্যদশা জলবিম্বপ্রায়,
জীবন ফেনের ন্যায় মিলাইয়া যায় ;
ধর্ম্মই অক্ষয় স্বর্গসুখের কারণ,
প্রাণপণে যে না করে তাহার সাধন,
বৃদ্ধকালে হয় তার অনুতাপ সার,
নিদারুণ দুঃখানল দহে অনিবার।

একদা এক বৈশ্য তুলসীদাসকে কহিল ;—ঠাকুর! আমি রঘুনাথজীর দর্শনলাভ করিতে ইচ্ছা করি, কৃপা করিয়া তাঁহার দর্শনলাভের উপায় করুন। তুলসী কহিলেন,—ভগবান্ রামচন্দ্রের দর্শনলাভ সহজ নহে, উহা কোটিজন্মসাধনার ফল। বৈশ্য কিছুতেই ছাড়িল না, বলিল,—দয়া করিয়া এখনি কোনও উপায় করুন। তুলসী তদীয় ভক্তি পরীক্ষার্থে কহিলেন,—তুমি এক কোশ কর, একটা বড়শা আনিয়া উহা ঊর্দ্ধমুখ করিয়া এস্থানে প্রোথিত কর, এবং তুমি এই বৃক্ষে উঠিয়া, বড়শার সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগের উপর বেগে ঝম্প দিয়া পড়। ইহাতে রামদর্শন হইলেও হইতে পারে। বৈশ্য ঐ কথা শুনিয়া শীহরিয়া উঠিল, কহিল,—ঠাকুর! বড়শার আগায় ঝাপ দিয়া পড়িলে আমার বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, আমি তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইব, কাজ নাই আমার রামদর্শনে, ইহা বলিয়া বৈশ্য প্রস্থান করিল। অন্যান্য লোকবৃন্দের সহিত এক ক্ষত্রিয় সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ঐ তামাসা দেখিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন,—এ মহাপুরুষের বাক্য মিথ্যা হইবে না। তিনি তুলসীর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ নিজহস্তস্থিত বড়শা সেই স্থানে পুতিলেন এবং বৃক্ষে আরোহণ করিয়া, "জয় রাম" শব্দে সেই বড়শার অগ্রভাগে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। অহো! বিধাতার ইচ্ছা অচিন্তনীয়! কে যেন আসিয়া তাঁহাকে শূন্যে ধরিয়া রাখিল। বড়শার অগ্রভাগ তাঁহার বক্ষস্পর্শ করিল না। তিনি চমকিত হইয়া দেখিলেন,—সম্মুখে এক অপরূপ নবদূর্ব্বাদলশ্যাম-মূর্ত্তি! দর্শকবৃন্দ বিস্ময়ে ও ভক্তিভরে বিহ্বল হইয়া তুলসীর জয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

মাদৃশ জড়বুদ্ধি লোকে মনে করিতে পারে,—ইহাও কি সম্ভব? সুতীক্ষ্ণ শূলাগ্রে ঝম্প দিয়াও অক্ষত রহিল! কিন্তু এরূপ অলৌকিক আশ্চর্য্য ঘটনা শত শত ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। কাশীর তৈলঙ্গস্বামীকে একজন খাঁয়ের সঙ্গে সুতীব্র বিষ ভোজন করাইয়াছিল, তিনি অম্লানমুখে বিষ

ভোজন করিয়া অবিকৃত রহিলেন। তাঁহার আত্মা তখন পরমাত্মার ধ্যানে তন্ময়, এজন্য তাঁহাতে বিষশক্তি ব্যর্থ হইল। ইহার গূঢ়তত্ত্ব প্রহ্লাদ-চরিত্রে বিবৃত আছে। যখন প্রহ্লাদের প্রাণ-সংহারের জন্য জল, অগ্নি, বিষ, বায়ু প্রভৃতি অশেষ প্রকার বধোপায় নিষ্ফল হইল, হিরণ্যকশিপু আর কোনও বধোপায় খুঁজিয়া পাইলেন না, তখন তিনি প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"প্রহ্লাদ সুপ্রভাবোঽসি কিমেতৎ তে
বিচেষ্টিতম্।
এতন্মন্ত্রাদিজনিতম্ উতাহো সহজং তব॥"

—প্রহ্লাদ তোমার আশ্চর্য্য প্রভাব! তোমার এ সকল কি ব্যাপার? একি তোমার স্বাভাবিক শক্তি? অথবা মন্ত্রাদি-শক্তি?

প্রহ্লাদ পিতৃচরণে প্রণত হইয়া কহিলেন;—

"ন মন্ত্রাদিকৃতং তাত! নবা নৈসর্গিকং
মম।
প্রভাব এষ সামান্যো যস্য যস্যাচ্যুতো হৃদি।"

—হে পিতঃ! ইহা মন্ত্রাদিশক্তিও নহে, আমার স্বাভাবিক শক্তিও নহে। সেই অবিকারী নারায়ণ যাহার যাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন, তাহার তাহার এ শক্তি সামান্য ব্যাপার।

সেই ক্ষত্রিয়যুবা সাধুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া একাগ্রচিত্তে ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়াছিলেন, ভক্তবৎসল তখনি আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন।—"রাখেন হরি, মারে কে?"

(ক্রমশঃ)

কাশ্মীর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

কাশ্মীরে যাইবার যে সকল পথ আছে তাহার মধ্যে রাওলপিণ্ডি হইতে শকট যাইবার উপযোগী যে পথ বিতস্তার (ঝিলমনদী) তীর দিয়া গিয়াছে, সেই পথই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম ও সুবিধাজনক। অন্যান্য পথ বড় দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল। খাদ্যদ্রব্য ও থাকিবার স্থান পাওয়া যায় না। কোন-প্রকার শকটই চলে না, অত্যন্ত চড়াই ও উৎরাই। কেবল ডাণ্ডি বা ঘোটকে যাওয়া চলে। জম্বু হইতে শ্রীনগরের পথ সর্ব্বাপেক্ষা সোজা ও কম; মধ্যে মধ্যে মহারাজের বিশ্রামাগার আছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। কিন্তু মহারাজের অনুমতি ব্যতীত বিশ্রামাগার পথিকদিগের জন্য উন্মুক্ত হয় না—এবং তিনি বন্দোবস্ত না করিয়া দিলে যান, বাহন, খাদ্যদ্রব্যাদি কিছুই মিলে না।

কিন্তু রাওলপিণ্ডি হইতে যে পথ গিয়াছে, তাহাতে সকল রকম যান বাহন চলে। চড়াই ও উৎরাই বেশী নাই। পথে

পান্থশালা, বিশ্রামাগার, ডাকবাঙ্গালা আছে। সর্ব্বদা লোকের যাতয়াতের জন্য কোনও বিপদের আশঙ্কাই নাই।

রাওলপিণ্ডি হইতে গাড়ি ঠিক্ করিতে হয়। ধনজিভাই নামক একজন পার্শি বণিক্ সরকারি ডাক লইয়া যাইবার জন্য কাশ্মীররাজ্য হইতে অনুমতি পাইয়াছে, সেইজন্য কাশ্মীররাজ্যের ভিতর গাড়ির ঘোড়া বদল করিবার আড্ডা ও ঘোড়া রাখিবার অধিকার আছে। শীঘ্র ঘোড়া বদল হয় বলিয়া তাহার গাড়িই সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র পৌঁছে। রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর ২০০ মাইল, এই পথ ধনজিভাইএর গাড়িতে আড়াই দিনে পৌঁছিয়া দেয়। টঙ্গা, ল্যাণ্ডো, ভিক্টোরিয়া, এক্কা প্রভৃতি সকল রকম যানই পাওয়া যায়। টঙ্গার ভাড়া ১২০৲ টাকা করিয়া, ইহাতে চালক ব্যতীত তিনজন মাত্র আরোহী যাইতে পারে। দুই একটী ট্রংক, একটী ছোট বিছানা, টিফিন বাক্স সহজেই টঙ্গায় যাইতে পারে—ইহা অপেক্ষা অধিক দ্রব্য লইয়া যাইতে হইলে এক্কা করাই সুবিধা। এক্কার ভাড়া ২০৲ হইতে ২৫৲ টাকার মধ্যে। কাশ্মীরে পৌঁছিতে সাড়ে তিন দিন লাগে।

ধনজিভাইএর আড্ডা ব্যতীত আরও কয়েকটী গাড়ির আড্ডা রাওলপিণ্ডিতে আছে। ইহাদেরও সকল রকমের গাড়ি কাশ্মীরে যাতায়াত করে, ভাড়াও কম। কিন্তু কাশ্মীররাজ্যের ভিতর ইহাদের ঘোড়া বদল করিবার অনুমতি নাই। কাজেই একটী জুড়িতে সমস্ত পথ, থামিয়া থামিয়া লইয়া যায়, সেই জন্য তাহাদের গাড়ি শ্রীনগর পৌঁছিতে ৫ দিন লাগে। এই সকল গাড়িওয়ালাদিগের মধ্যে 'Eclipse Carrying Co.' সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ও স্বত্বাধিকারী বাবু লালতা প্রসাদ অতি ভদ্রলোক।

যাহা হউক, আমরা ধনজিভাইএর আড্ডায় যাইয়া টঙ্গার বন্দোবস্ত করিলাম। স্থির হইল যে অতি প্রত্যূষে—এমনকি একটু রাত্রি থাকিতে আমরা রাওলপিণ্ডি হইতে যাত্রা করিব; তাহা হইলে মরি শৈলে পৌঁছিতে বেলা ১১টা হইবে। তথায় রাওলপিণ্ডির বন্ধুর একটী মিত্র কমিসরিয়েটে কর্ম্ম করেন—তাঁহার বাটীতে স্নানাহার সমাপন করিয়া বেলা ২টা নাগাইদ পুনরায় রওনা হইব।

এখানে বলা আবশ্যক, রাওলপিণ্ডি হইতে কাশ্মীর যাত্রা করিতে হইলে মরি শৈল পার হইয়া যাইতে হয়। এই পাহাড়টী উচ্চে নিতান্ত কম নহে—সমুদ্র-সমতল হইতে প্রায় ৭০০০ ফিট্ উচ্চ। ইহার উপর একটী ক্ষুদ্র সহর স্থাপিত হইয়াছে।

রাওলপিণ্ডি হইতে মরি ৩৮ মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে রাওলপিণ্ডি ও তৎ-সন্নিকটস্থ শ্বেতাঙ্গেরা এই শৈলাবাসে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করেন। বাঙ্গালার যেমন দার্জ্জিলিং, রাওলপিণ্ডি জেলার তেমনি মরি। মরিতে প্রথমতঃ ঐ দেশস্থ গোরা সৈন্যগণের জন্যই গবর্ণমেণ্ট সেনানিবাস প্রস্তুত করেন, ক্রমে ক্রমে অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ আসিয়া আবাস

নির্ম্মাণ করাতে একটু সহরে পরিণত হইয়াছে। এখানে ধনজিভাইএর ঘোড়া বদলাইবার একটী আড্ডা আছে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটী সাধারণের বিশ্রামাগার আছে।

পূর্ব্বোক্ত বন্দোবস্ত অনুসারে আমরা রাত্রি ৪টার সময় টঙ্গায় আরোহণ করিলাম। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ, অস্তগমনোন্মুখ সুধাংশুর ক্ষীণ রশ্মিজাল নিদ্রাকুলিত রাওলপিণ্ডির বক্ষে সুধাবর্ষণ করিতেছে। আমাদের টঙ্গা শৃঙ্গধ্বনি করিয়া ছাড়িয়া দিল। ক্রমে পরিচিত লোকালয়, বাজার ছাড়াইয়া মরির রাস্তায় পড়িল। রাস্তার দুইধারে সারি সারি শিশুগাছ যেন প্রহরীর স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। রাওন নদী উত্তীর্ণ হইলাম, বরাকু ডাক বাঙ্গালা ছাড়াইয়া গেলাম, রাত্রি প্রভাত হইল, উষার অরুণালোকে দেখিলাম যে, টঙ্গা ক্রমে উচ্চে উঠিতেছে, দূরে গিরি-শৃঙ্গ সকল প্রতিভাত হইতেছে। এখন বেশ প্রতিভাত হইতেছে। এখন বেশ প্রভাত হইয়াছে—টঙ্গা এখন প্রায় ৪০০০ ফুট উচ্চে পার্ব্বতীয় পথ ধরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গিরি-শ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল—ট্রেট্ ডাকবাঙ্গালা ছাড়াইলাম,—চড়াই ক্রমশঃ বেশী হইতে লাগিল—৩মাইল অন্তর ঘোড়া বদল হইতে লাগিল, একটী ক্ষুদ্র অরণ্য অতিক্রম করিলাম, ৩২॥০ মাইলের নিকট মরির প্রসিদ্ধ ভাঁটিখানা দেখিলাম। তাহার পর "সনিব্যঙ্ক" নামক হোটেল ছাড়াইয়া টঙ্গা মরি সহরের রাস্তায় প্রবেশ করিল। প্রায় তিন মাইল যাইবার পর ধনজিভাইএর আড্ডায় টঙ্গা পৌছিল। তখন প্রায় ১২টা বাজিয়াছে। আমরা সেখানে টঙ্গা ছাড়িয়া দিয়া পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর বাটীর অনুসন্ধানে চলিলাম। চৌরাস্তায় বন্ধুর ভৃত্য দাঁড়াইয়া আছে—পরিচয়ের পর বন্ধুর বাটীতে গেলাম। অতি সমাদরের সহিত অভ্যর্থিত হইলাম। ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি পর্য্যন্ত যে কি রকম করিয়া আমাদের আপ্যায়িত করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। ক্ষণেক বিশ্রামের পর স্নানাহার সম্পন্ন করা গেল। গৃহস্বামী ছাড়িবার পাত্র নহেন—অনেকক্ষণ ধরিয়া গল্প করা গেল। বেলা ২টার সময় বিদায় লইয়া টঙ্গা-আফিসে আসিলাম—আসিবার সময় মনটা বড় কাতর হইয়াছিল। সেই দুই ঘণ্টার মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল, সে আদর, সে যত্ন ভুলিব না—শিশুদিগের সে মিষ্ট অভ্যর্থনা চিরদিন মনে থাকিবে। আসিবার সময় যখন মনে হইল যে, ইহার পর আর বঙ্গবাসীর আশ্রয় মিলিবে না—আমাদের ভাষা, আমাদের আচার ব্যবহার, আমাদের রীতিনীতির সহিত পরিচয়ের এই শেষ স্থান পার হইলাম, ইহার পর যে দেশ দিয়া যাইব, যে গ্রামে বা নগরে আশ্রয় লইব—সে স্থানের লোক হয়ত আমার আচারব্যবহারে হাসিবে, হয়ত আমার রীতি নীতি, ভাব-ভঙ্গী তাহারা বাতুলতা বলিয়া মনে করিবে। আজ পর্য্যন্ত

স্বদেশবাসীর আশ্রয়ে ছিলাম—রাত্রি প্রভাতে বিভিন্ন রাজ্যে বিদেশীর অনুগ্রহে জীবনধারণ করিতে হইবে। যাহা হউক, বেলা প্রায় ২॥০ টার সময় পুনরায় টঙ্গায় আরোহণ করিলাম। টঙ্গা দ্রুত-বেগে মরি অতিক্রম করিয়া পাহাড়ের অপর পার্শ্ব দিয়া নামিতে লাগিল। এখন হইতে উৎরাই আরম্ভ হইল—কোহালা ডাকবাঙ্গালা পর্য্যন্ত একেবারে ঢালু। রাস্তার একদিকে অভ্রভেদী পর্ব্বত, অপর দিকে ভীতিপ্রদ খাদ। মরি হইতে কোহালা সাড়ে সাতাস মাইল, ইহার মধ্যে কোন বিশ্রামভবন নাই। কাশ্মীর হইতে ফিরিবার সময় ইহার অভাব বড়ই অনুভূত হয়। কোহালা ব্রিটিশরাজ্যের শেষ সীমা। একদিকে মরিশৈল, অপর দিকে কাশ্মীররাজ্যের ভূধরমালা—মধ্যে মধ্যে বিতস্তার সলিলপ্রবাহ শ্বেত রেখার ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। নামিতে নামিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল; নদীর অপর তীরের শৈলশ্রেণীর নিবিড় জঙ্গলের মধ্যস্থ কৃষকদিগের কুটীর হইতে একটী একটী করিয়া দীপ সন্ধ্যাতারার ন্যায় ফুটিতে লাগিল। ক্রমে চন্দ্রোদয় হইল। এতক্ষণ যে বিতস্তা, শীর্ণতোয়া এবং অস্পষ্ট রেখাবৎ দেখা যাইতেছিল, এখন তাহার কলনাদ শ্রুত হইতে লাগিল এবং উদীয়মান চন্দ্রালোকে তাহার সফেন বিপুল প্রবাহ হিমালয়ের যশোধারার ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)।

পাগল মন।

১

হাসিছে প্রকৃতি,
হাসিছে জগত,
আমি কেন তবে
হাসিব না।
ভাসিছে জগত
সুখ-সরোবরে,
আমি কেন তবে
ভাসিব না॥

২

ছিল একদিন
আমার(ও) ধরায়,
হেসেছি কতই
পরাণ খুলে।
বিষাদ অশান্তি
যেত দূরে ভাসি,
পারেনিত কভু
ছুঁইতে ভুলে॥

৩

(আজ) কোথা সেই হাসি,
কোথা সেই খেলা,
কোথা সে আমার
শান্তি অমল।
অশান্তি-কালিমা

ভরা এ হৃদয়
বড় জ্বালাময়
তীব্র গরল॥

৪

গাহিতেছে পাখী
খুলিয়া পরাণ
আপন আনন্দে
আপনা হারা।
আমিও গেয়েছি
ওই পাখী মত
ঢালিয়া কতই
সুধার ধারা॥

৫

খেলিতেছে শিশু
নির্ম্মল আনন্দে
জগত সংসার
সকলি ভুলে।
আমিও খেলেছি
ওই শিশু মত
সরল পরাণে
হৃদয় খুলে॥

৬

কত নর নারী
কত সাধ আশা
নিমেষে নিমেষে
উথলে বুকে।
আমিও অমনি
কত সুখ ছবি
কল্পনার সাথে
এঁকেছি সুখে॥

৭

সুখ বাল্যকাল,
মধুর কৈশোর,
সুখের যৌবনে
কতনা ছবি!
(আজ) হতাশ নিরাশ,
হারায়ে সকল,
দুখের এ গানে
হয়েছি কবি॥

৮

উৎসবের বাঁশী,
মধুর রাগিণী,
আর ত বাজে না
আমার পুরে।
শরৎ বসন্ত,
মলয় পবন,
আমারে ফেলিয়া
গিয়াছে দূরে॥

৯

কুহেলিকা মাখা
জীবন আমার
একটু হেথায়
না আসে আলো।
হাসেনা চাঁদিমা,
হাসে না তপন,
চিরদিন সম
আঁধার কালো॥

১০

আঁধারে রয়েছি
আঁধারে চলেছি
আঁধারেই ফিরি
হারাই পথ।

সঙ্গী সাথী নাই
একেলা একেলা
এমন করিয়া
রহিব কত ॥

১১

(তাই) হাসিরাশি হেরি,
হাসিবারে যাই,
আগেই নয়নে
আসেরে ধারা।
হাসিছে জগত,
প্রাণিবৃন্দ হাসে,
তুই কেন মন!
পাগল পারা ॥

প্রণয়ে প্রমাদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দশজনে বলে, কোনও দূরদেশে গিয়া তুমি নাকি আবার বিবাহ করিয়া আসিয়াছ। এই বলিয়া দুবুটী ঠাকুরাণী কথা আরম্ভ করিলেন।

স্বামী কহিলেন হাঁ করিয়াছি।

স্ত্রী তখন আকাশ হইতে পড়িয়া গিয়া কহিলেন কি আবার বিবাহ করে এসেছ?

স্বামী—হাঁ বিয়ে করে এসেছি।

স্ত্রী—কেন?

স্বামী—তোমার সন্তান হয় নাই বলিয়া।

স্ত্রী—আর?

স্বামী—আর কিছু না।

স্ত্রী—আর প্রথম যৌবন গিয়েছে বলিয়া! জবা ঠাকুরাণী ত একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন।

স্বামী সে কথার কোনই উত্তর দিলেন না। স্ত্রী আবার কহিলেন, কোথায়?

স্বামী—বহুদূর। কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার মনে কষ্ট দিয়া বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছি, এ অনুতাপে আমি মরিব। এই বলিয়া স্বামী কাঁদিতে লাগিলেন।

বিশুদ্ধচরিত্রা সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর মুখে কাতর বাণী শুনিয়া উপস্থিত সুখ, দুঃখ সব ভুলিয়া গেলেন। বস্ত্রাঞ্চলে স্বামীর চক্ষুজল মুছাইয়া কহিলেন, কাঁদিও না, তুমিত আর সৃষ্টিছাড়া কাজ কর নাই।

স্বামী—আমি তোমার মলিন মুখ দেখিতে পারিব না।

"না, তোমার তাহা দেখিতে হইবে না, এই আমি হাসিতেছি" বলিয়া সাধ্বী স্ত্রী হাসিতে লাগিলেন।

স্বামী—দেখ ছয় মাস চাকুরী করি, ছয় মাস বসিয়া থাকি, এইরূপ গোলমালে টাকা পয়সার সংস্থান করিতে পারি নাই। একটা বাড়ীও করা হয় নাই। এই সব কারণে মন বড় খারাপ হইয়াছে।

স্ত্রী কহিলেন, আমি বাঁচিয়া থাকিতে তোমার অসুখ কিসের?

স্বামী—টাকার অভাব তুমি কিরূপে নিবারণ করিবে?

কেন আমার গহনাগুলি লও, কলিকাতায় একটী বাড়ী কর। যখন তোমার কাজ থাকিবে না, তখন সেই বাড়ীতে দুসতীনে গিয়া বাস করব। যখন তোমার কাজ থাকে না, তখন আমি পিত্রালয়ে বাস করি, কিন্তু সতীন্ লইয়া ত তাহা পারিব না। একটা বাড়ী করিতেই হইবে, এই বলিয়া দুবুটী ঠাকুরাণী গহনার বাক্স আনিয়া স্বামীর হাতে দিলেন, স্বামী দ্বিরুক্তি না করিয়া স্ত্রীর গহনাগুলি গ্রহণ করিলেন।

শাবন্ত ইঞ্জীনিয়ারী করিয়া অনেকগুলি জিনিস পত্র কিনিয়াছিলেন। এক দিন দুবুটী ঠাকুরাণী স্বামীকে কহিলেন, বাড়ী ঘর নাই, তোমার জিনিসগুলি লইয়া আমার বড় অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। স্বামী কহিলেন,"—আচ্ছা।"

পর দিন বৈকালে দুবুটী ঠাকুরাণী বেড়াইতে গিয়েছিলেন, কতিপয় প্রতিবাসী স্ত্রীলোক গিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, তাঁহার স্বামী তাঁহার সমুদয় জিনিসপত্র লইয়া চম্পট দিতেছেন।

স্ত্রী যতদূর সম্ভব দ্রুতপদে আসিয়া দেখিলেন, প্রতিবাসিনীর কথাই সত্য। ব্যাপার যে কি, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না, গরুর গাড়ীর উপর হইতে জিনিসপত্রগুলি নামাইয়া রাখিলেন। স্বামীও কিছু কহিলেন না, ধুতি চাদর পরিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন, আর গৃহে ফিরিলেন না। স্ত্রী ভাবিলেন, স্বামী বাড়ী করিতেই কলিকাতা গিয়াছেন, তিনি তখন পিত্রালয়ে ছিলেন। পিত্রালয়েই রহিলেন, কিন্তু এক বৎসর স্বামীর কোন চিঠিপত্র পাওয়া গেল না। অতঃপর শুনা গেল, শাবন্ত বাবু নববিবাহিতা স্ত্রী লইয়া আসাম চলিয়া গিয়াছেন। সেইখানে তাঁহার কাজও হইয়াছে।

স্বামী বাড়ী করেন নাই; তাহার গহনাগুলিও ফেরত দেন নাই; নবপরিণীতা পত্নীসহ বহুদূরদেশে চলিয়া গিয়াছেন, এই ভয়ানক কুসংবাদ শ্রবণ করিয়া দুবুটী ঠাকুরাণী প্রথমে শিরে করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করিলেন, তাহার পর তাহার ভাগিনাকে সঙ্গে করিয়া আসামে চলিলেন।

বাসন্তী উষা চলিয়া গেল, প্রীতিময়ী প্রভাতীর সঙ্গে সঙ্গে অযুত ফুল ফুটিয়া উঠিল। কোকিলের কলনাদে ঝলকে ঝলকে মধু বর্ষণ হইতে লাগিল, বালারুণ তখনও জ্যোতি বিকিরণ করে নাই, সমীরণ তখনও বরফের মতন শীতল। এই সময়ে দুবুটী ঠাকুরাণী স্বামীর সংসারে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার স্বামী শয্যায় শুইয়া তখনো নাসিকা গর্জ্জন করিতেছিলেন, পার্শ্বে বালিকা স্ত্রী নিদ্রায় অভিভূতা। মামীকে দূরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ভাগিনা দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন, এবং মামা! মামা! বলিয়া ডাকিলেন। শাবন্ত বাবু জাগ্রত হইয়া বলিলেন, কেও?

ভাগিনা। আজ্ঞে আমি।

মামা। কেও, রশ্মি?

ভাগিনা। আজ্ঞা।

মামা উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন, কহিলেন, সব ভাল ত?

ভাগিনা—মামীমা এসেছেন।

অাঁ, অাঁ অাঁ তোমার মামীমা কে? কে? বলিতে বলিতে মামামহাশয় একেবারে বসিয়া পড়িলেন। ভাগিনা বলিলেন,—চিনিতে পারিতেছেন না?

সেই সময় শাবন্তবাবুর নববিবাহিতা স্ত্রী শয্যা হইতে উঠিয়া দরজার ফাঁক দিয়া স্বামীর দিকে বার বার চাহিতে ছিলেন। স্বামী সে ভাব দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আপনার মনোভাব গোপন করিয়া ফেলিলেন, ও তাড়াতাড়ি বালিকা স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, তোমার দিদি এসেছেন স্থল!

স্থলপদ্ম—আপনি যখন আমাকে বিবাহ করেন, তখন বলিয়াছিলেন আপনার মধ্যমা স্ত্রী কুৎসিতা, কুরূপা, চিররুগ্না ও চলৎশক্তিহীনা।

স্বামী—ওঃ! সে তোমার চিত্তরঞ্জনের জন্য।

এই কথার পরই ছুবুটী ঠাকুরাণী গৃহে প্রবেশ করিলেন। স্বামীর কথা, সতীনের কথা, ছুই শুনিলেন। তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল।

স্বামী—একি? এত দূরের পথ একজন বালকের সঙ্গে আসিয়াছ, তোমার কি ইজ্জতের ভয়ও নাই?

ছুবুটী—আছে বইকি, তবে পেটের দায়ে সবই করিতে হয়। যখন গহনাগুলি লইয়া পলাইয়েছিলে, তখন এই ক্ষুৎ-পিপাসিতার ইজ্জত কে রক্ষা করিয়াছিল?

স্বামী—সে কথা এখন থাক, এখন যাও, ঐ সাম্‌নে একটা দিঘী আছে, সেইখানে গিয়া হাত মুখ ধুইয়া এস। বেলা হইলে লোক জানিবে। ছুবুটী ঠাকুরাণী তাহাই করিলেন।

এই অবসরে তাহার স্বামী লোহার বাক্সটা সরাইয়া ফেলিলেন। ছুবুটী ঠাকুরাণীর ভাগিনা এ সংবাদ তাহাকে জানাইলেন। তিনি বুঝিলেন, সেই লোহার বাক্সে তাঁহার গহনা ছিল। তিনি কাঁদিয়া কাটিয়া স্বামীকে কহিলেন। স্বামীও রাগিয়া কুঁদিয়া উত্তর দিলেন, "বেশ আমার যা-খুসী করব, তোমার তাতে দরকার কি?

ছুবুটী—লোহার বাক্সের কথায় আমার দরকার নাই সত্য, কিন্তু আমার গহনাগুলির কথায় ত আমার দরকার আছে। সেগুলি কোথায় রেখেছ আমি শুনিতে চাই।

(ক্রমশঃ)।

আমরা কি চাই।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

(৬) দেশের কতকগুলি কাজ করিবার জন্য একটী সম্প্রদায় গঠিত হওয়া প্রয়োজন হইয়াছে। এই সম্প্রদায় নেতৃবর্গদ্বারা চালিত হইবে। গ্রামে গ্রামে দুই একজন, নগরে নগরে বিশ, পঁচিশ জন এই দলের লোক থাকা চাই। ইঁহাদের প্রধান কাজ হইবে লোকশিক্ষা। ইঁহাদিগকে চরিত্রবলে বলীয়ান্ হইতে হইবে, এবং দেশের উপকারার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সকল ধর্ম্ম এবং সকল জাতির প্রতি ইঁহাদের সমভাব হওয়া চাই।

মৃত মহাপ্রাণ নফরচন্দ্র কুণ্ডু এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার একজন উপযুক্ত লোক ছিলেন। ইঁহাদের ভরণপোষণের ভার দেশকে লইতে হইবে, কারণ নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনা ভাবিতে হইলে সাধারণের কাজে ইঁহারা মন ও বেশী সময় দিতে পারিবেন না। এ কাজের জন্য প্রচুর অর্থ চাই; পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রায় সকল কাজই অর্থ সাপেক্ষ। অর্থ আমাদিগকে যোগাইতে হইবে। না পারি কাজ হইবে না। তবে রোম নগর এক দিনে গঠিত হয় নাই। আমাদের শক্তি অনুসারে অল্প মাত্রায় কাজ আরম্ভ করা হউক। ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিষ্যতের উপর অর্পণ করা যাইতে পারে। যে সব লোক এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন, অবস্থানুসারে তাঁহাদের অনেককেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে। স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের ভাবনা যদি ভাবিতে হয়, বিলাস দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা যদি থাকে, তাহা হইলে কর্ত্তব্য পালনে ইঁহারা সক্ষম হইবেন না। সাধারণতঃ এই নিয়ম হওয়া চাই, অবস্থাভেদে ইহার ব্যতিক্রম হইতে যে না পারিবে এরূপ নয়। উপরে বলিয়াছি, ইঁহাদের কাজ হইবে প্রধাণতঃ লোকশিক্ষা। শিক্ষার মানে অবশ্য সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা। দেশের সকল ভাল কাজে ইঁহাদিগকে অগ্রগামী হইতে হইবে, এবং দেশের লোককে চরিত্রের উচ্চতম আদর্শ দেখাইতে হইবে। চিরজীবনই যে ইঁহাদিগকে সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিতে হইবে তাহা নহে। একটী নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত কাজ করার পর সকলের সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিবার অধিকার থাকিবে। দেশে অনেক বিধবা রমণী আছেন। তাঁহাদিগকে কি এই সম্প্রদায়ের এক শাখাভুক্ত করিয়া দেশের অনেক কাজে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারিবে না? আমাদের মধ্যে শিক্ষয়িত্রীর বড় অভাব। প্রতি গ্রামের দুই চারিটী বিধবাকে শিক্ষকতাব্রত গ্রহণ করাইতে পারিলে দেশের কি কি মঙ্গল হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বর্ত্তমান অবস্থায় কাজটা সম্ভবপর কি বলিতে পারি না,

কিন্তু চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি? একাগ্র যত্ন ও চেষ্টায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। বিধবাদের উপযুক্ত আরও অনেক কাজ আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা উল্লেখ করিলাম না।

(৭) সমাজসংস্কার। সমাজে অনেকগুলি কদর্য্য প্রথা আছে। ক্রমে ক্রমে তাহাদের উচ্ছেদসাধনা করিতে না পারিলে আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব না। বামাবোধিনীর কলেবরের পক্ষে প্রবন্ধ খুব বড়ই হইয়াছে, এবং সমাজসংস্কার বড় বিশাল প্রশ্ন। এ স্থানে এ প্রশ্নের আলোচনা হওয়া অসম্ভব; এ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে চাই মাত্র। আমরা নিশ্চেষ্ট এবং এই নিশ্চেষ্টতা সজীব; আমরা রক্ষণশীল, এবং এই রক্ষণশীলতা অন্ধ। এখন আমাদিগকে এই সজীব নিশ্চেষ্টতাকে নির্জীব করিতে হইবে, এই অন্ধ রক্ষণশীলতাকে চক্ষুষ্মান্ করিতে হইবে। যে সব প্রথা আমাদের উন্নতির প্রতিকূল, একতার প্রতিকূল, তাহাদিগকে বর্জ্জন করিতে হইবে; নতুবা আমাদের বিনাশ নিশ্চিত। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিব মাত্র। হিন্দুর মুসলমানের প্রতি যে ঘৃণা, তাহা দূর করিবার সময় কি আসে নাই? বাঙ্গালায় হিন্দু মুসলমানে একত্র মিলা মিশা যত কম, হিন্দুস্থানের আর কোথাও তত নয় বলিয়া মনে হয়। হিন্দুর ঘরে কুকুর প্রবেশ করিলে যে সব জিনিষ নষ্ট হয় না, মুসলমান প্রবেশ করিলে তাহা নষ্ট হয়। ইহা কি ঠিক? ইহা কি আত্মদ্রোহিতা নয়? মুসলমানকে বলি হিন্দুকে কি তোমার পর ভাবা উচিত, পর ভাবিলে কি চলিতে পারে? তাহাকে "কাফের" বলিয়া ঘৃণা করিলে, তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিলে কি তোমার কিছু ক্ষতি হইবে না? তোমার কর্ত্তব্য পালনে দোষ পড়িবে না? হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্মভেদ ও কিয়ৎপরিমাণে আচারভেদ আছে বলিয়া কি তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপিত হইতে পারে না? তারপর হিন্দুসমাজের নিম্নতর স্তরের প্রতি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যাউক। উচ্চতর স্তরের হিন্দুর নিম্নতর স্তরের হিন্দুর প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। যদি সমাজ ছারখার করিবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে নিম্নতর জাতির প্রতি এ নিষ্ঠুর ব্যবহার পরিহারের সময় আসে নাই কি? এই অত্যাচার ও উৎপীড়নে তারা যদি হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে বড় ভাল হইবে কি? অনেক জাতি আছে, যাহাদের লোকেরা বেশ শিক্ষিত ও মার্জ্জিত হইলেও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা তাঁহাদের সঙ্গে একাসনে বসেন না; যাহাদের লোকেরা খুব নিষ্ঠাবান্ হইলেও তাহাদের জল স্পর্শ করেন না। জিজ্ঞাসা করি,—এরূপ আর কতদিন চলিবে? সময় ও শিক্ষার গুণে নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ

ক্রমে প্রবল হইতেছে। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা যদি ইহাকে উৎসাহ না দিয়া অবজ্ঞা করেন, ক্ষতি বেশী হইবে তাঁহাদেরই এবং সমাজের বিশেষ অপকার হইবে। আর এক দিকে দেখুন। সমাজের এক জাতির ভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ হয় না। রাঢ়ীয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বারেন্দ্রশ্রেণীর বাড়ী বিবাহ করিতে পারেন না। দক্ষিণরাঢ়ীর কায়স্থ উত্তররাঢ়ীর কায়েস্থের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিতে পারেন না। অন্যান্য জাতির ভিতরও এরূপ। এক শ্রেণীর ভিতরেও সকলের সঙ্গে সকলের কুটুম্বিতা হইতে পারে না। ইহাতে কি সমাজের অনিষ্ট হইতেছে না? এ দুষ্ট প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা সকল বুদ্ধিমান, দেশহিতৈষী ব্যক্তির করা উচিত। সুখের বিষয় এই যে, অধুনা কায়স্থ সমাজে এই প্রথা উঠাইবার কিয়ৎ পরিমাণে চেষ্টা হইতেছে। ক্রমে ক্রমে বাল্যবিবাহ উঠান দরকার নয় কি? কিন্তু অনেক শিক্ষা ও জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিকেও আপন আপন শিশু পুত্র-কন্যার বিবাহ দিতে দেখিতে পাই। বাল্যবিবাহের অত্যাচারে আমরা ক্রমে হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছি, বালক-বালিকার শরীর উৎসন্ন যাইতেছে, রুগ্ন ও নির্জীব সন্তান উৎপন্ন হইতেছে, মানসিক বল ও তেজের, উদ্যম ও অধ্যবসায়ের উদ্রেক হইতেছে না, তবু কয়জনকে এই কুপ্রথা নিবারণের চেষ্টা করিতে বদ্ধপরিকর হইতে দেখা যায়? এবং ইহার উচ্ছেদসাধন না হইলে আমাদের [illegible] ভরসা কিছু আছে কি? [illegible] সম্বন্ধে এখানে আর কিছু [illegible] চাহি না। আমার মনের ভাব [illegible] হইবে।

(৮)

বঙ্গীয় হিন্দুমহিলাকে দুই এক কথা বলিয়া আজ ক্ষান্ত হইব। সে দিন এক ইংরাজী কাগজে দেখিলাম,—স্বদেশী বস্ত্র প্রচারে তাঁহারা প্রধান সহায় হইয়াছেন। তাঁহাদের ভয়ে ইচ্ছা থাকিলেও অনেক পুরুষসিংহকে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। বঙ্গ মহিলার এ কথা গৌরবের কথা নয়! এখন আর কে বলিবে যে তাঁহারা অবলা? তাঁহারা খুব প্রবলা। তাঁহাদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন যে,—তাঁহারা সমাজের কল্যাণ সাধন ব্রত গ্রহণ করুন এবং সামাজিক কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধপরিকর হউন। কবির কথা ঠিক।

"না জাগিলে সব ভারতললনা।
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

দেশের শিশুদিগের হৃদয়ে যদি উচ্চ ও উদার ভাবের বীজ বপন করিতে হয়, তাঁহারা ছাড়া তাহা কে করিতে সক্ষম? দেশের পুরুষদিগকে যদি সৎকাজে ব্রতী করিতে হয়, তাঁহারা না করিলে তাহা আর কে করিবে? মুসলমান ও নিম্নতর জাতির প্রতি ব্যবহারের মূলে তাঁহারা। উহার ছোঁয়া জিনিষ গ্রহণ করিলে উহাকে স্পর্শ করিলে অশুচি হইতে হইবে এই

গর্ব তাহার প্রাবল্যের প্রধান হেতু তাহারা সকল দিক ভাবিয়া এ সম্বন্ধে যদি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহারা একটু উদারতা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে যে কি কল্যাণ সাধিত হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাল্যবিবাহের মূলেও অনেকটা তাঁহারা। শিশু পুত্র কন্যার বিবাহের জন্য তাঁহারা জিদ করেন বলিয়াই বাল্যবিবাহের সংখ্যা বিশেষরূপ কমিয়া যাইতেছে না। মহিলারা যদি ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, কোন পুরুষের ইহাকে বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টা করিবার সাহস কুলাইবে? করজোড়ে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা সমাজসংস্কার-ব্রত গ্রহণ করুন, আমাদের সকল বাধাবিঘ্ন অন্তর্হিত হইবে।

"বন্দে মাতরম্।"

স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মবৃত্তান্ত ও সংক্ষিপ্ত বাল্যলীলা।

এই মহাপুরুষের কথঞ্চিৎ পরিচয় আমরা ১৩১৩ সালের বামাবোধিনীর ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি। এবারে তাঁহার অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত এবং বাল্যলীলা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জব্বলপুরে ঠগী আপিসে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, এবং তথায় স্বকৃত ভবনে সপরিবারে বাস করিতেন। হরচন্দ্রের প্রথম কন্যা ভবতারিণীর জন্মের পরে জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবীচরণ এবং কন্যা নিস্তারিণী জন্মগ্রহণ করেন। এই সন্তানত্রয়ের জন্মের পরে ১৪ বৎসর কাল হরচন্দ্রের আর সন্তান সন্ততি হয় নাই।

হরচন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহেশ চন্দ্র অল্প বয়সে সন্ন্যাসীর বেশে গৃহত্যাগ করেন। আর সন্তান হইল না বলিয়া, হর চন্দ্র ও তদীয় পত্নী চন্দ্রমণি মনোদুঃখে কালযাপন করিতেছিলেন। এই সময় হর চন্দ্রের সেই সন্ন্যাসী ভ্রাতা মহেশ চন্দ্র আসিয়া দেখা দেন, এবং ভ্রাতৃবধূ চন্দ্রমণিকে একটী মাদুলী দিয়া বলেন, "ইহা ধারণ করিলে আবার সন্তান হইবে।

এই ঔষধ ধারণের অনতি বিলম্বে চন্দ্রমণির সন্তানের লক্ষণ হইল। দশ মাস দশদিন অতীত হইলে একদিন চন্দ্রমণির প্রসববেদনা উপস্থিত জানিয়া, হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ধাত্রী ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাঁহার সেই সন্ন্যাসী ভ্রাতা বগলে একটী কাল পাঁটা, হস্তে একখানি ছুরিকাসহ বনমধ্য হইতে আসিয়া দেখা দিলেন, এবং বলিলেন,— ধাত্রী ডাকিতে

হইবে না।"তখন তিনি পাঁঠাটী বাম হস্তে শূন্যে ধারণ করতঃ দক্ষিণ হস্তস্থ সুতীক্ষ্ণ ছুরিকার একাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। তন্মুহূর্ত্তে প্রসূতির সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। সন্ন্যাসী মহেশ চন্দ্র নব প্রসূত সন্তান বক্ষে ধারণ করিলেন, এবং স্বহস্তে তাহার নাড়ী কাটিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে সাত মাস অতীত হইল। সন্তানের অন্নপ্রাশন দিবার জন্য হরচন্দ্র আয়োজন করিলেন এবং অন্নপ্রাশনের দিন স্থির করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে সন্ন্যাসী ভ্রাতা মহেশচন্দ্র পুনঃ দেখা দিলেন, এবং শিশুর অন্নপ্রাশন কার্য্য শেষ করিয়া উহার নাম কালীচরণ রাখিলেন। মহেশ চন্দ্র এবার যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "এই ছেলেকে তোমরা কোনরূপ কষ্ট দিওনা; কষ্ট দিলে তোমরা ইহাকে রাখিতে পারিবে না।"

কালীচরণের পঞ্চম বর্ষ বয়সে হরচন্দ্র তাহার হাতে খড়ি দিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবীচরণের প্রতি শিশুর বিদ্যাশিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। একদিন শিক্ষাদান কালে তিনি কালীচরণকে একটী চপটাঘাত করেন। এই সামান্য প্রহারে কালীচরণ অবিরাম কান্দিতে লাগিলেন। কান্না কিছুতেই থামেনা। পিতা মাতা চিন্তাকুল হইলেন। এমন সময় সন্ন্যাসী মহেশচন্দ্র পূর্ব্ববৎ আবির্ভূত হইলেন এবং রোরুদ্যমান শিশুকে বক্ষে ধারণ করিলেন। কালীচরণের ক্রন্দন থামিল। সন্ন্যাসী রোষভরে বলিলেন,—"তোমরাএই অমূল্য রত্নকে না চিনিয়া ইহাকে কষ্ট দিতেছ, অতএব ইহাকে রাখিতে পারিবে না"। এই বলিয়া তিনি কালীচরণকে মাতৃক্রোড়ে অর্পণ করতঃ প্রস্থান করিলেন। চন্দ্রমণি অনেক অনুনয় বিনয়ের সহিত তাহাকে ফিরিয়া আসিবার জন্য আহ্বান করিলেন, কিন্তু মহেশচন্দ্র ফিরিলেন না।

কালীচরণ এগার বর্ষে পদার্পণ করিলেন। হিন্দু প্রথানুসারে উহার উপনয়নের দিন স্থির হইল। কালীচরণকে কালীঘাটে লইয়া দীক্ষা দেওয়া হইল। উপনয়নের দিন "ইহাকে তোমরা রাখিতে পারিবে না," সন্ন্যাসীর এই ভবিষ্যৎ বাণী মনে হওয়ায় সকলে মায়ের মন্দিরাভ্যন্তরে কুণ্ডলী করিয়া তন্মধ্যে কালীচরণকে রাখিয়া মন্দিরের দরজা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করতঃ রাত্রিযাপন করিলেন। সকলের মনে ভয় ছিল, পাছে কালীচরণ এই রাত্রে দণ্ডী হইয়া বাহির হইয়া যান। এই রাত্রি নিরাপদে প্রভাত হওয়ায় সকলেরই সাহস হইল কালীচরণ সংসারত্যাগী হইবেন না। সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎ বাণীর ভয় কটিয়া গেল।

কালীচরণ অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। স্নান আহ্নিক না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। তিনি ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী পাঠ করিতেন এবং ভ্রাতা ভগ্নীদিগকে দেব দেবীর বন্দনাদি শুনাইতেন। কালীচরণ মধুরভাষী ছিলেন বলিয়া চন্দ্রমণি কালীচরণের নিকট রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ শুনিতেন।

কিছুকাল পরে কালীচরণের পিতার মৃত্যু হইল। তদীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর দেবীচরণ পশ্চিমাঞ্চলে জব্বলপুরে পৈতৃক আবাসে বাস করিতে লাগিলেন। কালীচরণ কলিকাতায় বাসা করিয়া বিধবা ভগিনী ও ভ্রাতৃপুত্র সহ বাস করিতে লাগিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য অধ্যয়নে প্রবৃত্ত থাকিলেন।

প্রগাঢ় যত্ন ও অসামান্য অধ্যবসায় প্রভাবে কালীচরণ অচিরে কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অতুলনীয় স্মরণশক্তি ছিল। কোন নূতন পুস্তক পাইলে তিনি আদ্যোপান্ত পাঠ করতঃ মর্ম্ম গ্রহণ করিতেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম পুস্তক বাইবেল কালীচরণ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া উহার সার গ্রহণ করিলেন, ইহাতে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। সরলতা সত্যপরায়ণতা ও উদারতাগুণে কালীচরণ খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক মিশনারীদিগের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলেন।

কালীচরণ যে বিধবা ভগ্নী ও ভ্রাতৃপুত্র সহ কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন, তাহারা একে একে কালগ্রাসে পতিত হইল। কালীচরণ খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তিনি কলিকাতায় মিশন হাউসে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে তিনি জ্যেষ্ঠের নিকট ইংরাজিতে "হৃদয়বিদারক যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্রিয় দাদা,

সম্প্রতি আমাদের যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা আপনার গোচরার্থে এই পত্রখানি লিখিতেছি। আমাদের প্রিয়তম বিধবা ভগ্নী মায়াপাশ ছিন্ন করতঃ পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। আপনার হৃদয়সর্ব্বস্ব, আশার আধার প্রিয়তম আত্মজ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়ায় আপনার হৃদয়ে অতুল আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু দাদা, আপনার হরিষে বিষাদ জন্মাইয়া আমি খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি। না জানি এই পত্র পাঠে আপনার কি শোচনীয় অবস্থা ঘটিবে! যাহা ঘটিয়াছে, তাহা অনিবার্য্য, ভাবিলে বা আর্ত্তনাদ করিলে কোনও ফল হইবে না।"

অনেক দিন পরে কালীচরণের পত্র পাইয়া অগ্রজ ব্যগ্রচিত্তে সহর্ষে পত্র উন্মুক্ত করিলেন। পত্র পাঠ করিতে করিতে নয়নজলে তাঁহার বক্ষ প্লাবিত হইল, এবং কান্দিতে কান্দিতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল। ক্ষণেক পরে উন্মত্ত প্রায় হইয়া এক কাটারী হস্তে "কেলেকে কাটিব" বলিয়া বেগে ধাবিত হইলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী চাকর ছুটিল।

রেল ষ্টেসনের সকলেই তাঁহাকে চিনিত ও সম্মান করিত। ষ্টেসন মাষ্টার ভৃত্যের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে কলিকাতার টিকিট দিয়া ভৃত্য সহ প্রেরণ করিলেন।

কলিকাতায় পৌছিয়া তিনি উন্মত্ত ভাবে কালীচরণের নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা মিশন

হাউস অভিমুখে চলিলেন। মিশন হাউসের* নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি কালীচরণের দৃষ্টি-গোচর হইবামাত্র কালীচরণ দ্বিতল হইতে অবতরণ করিলেন এবং মিশনহাউশের আঙ্গিনায় ভ্রাতৃদ্বয় গলাগলি করিয়া কান্দিতে কান্দিতে ভূতলে লুণ্ঠিত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মিশন হাউসের ভদ্রবৃন্দ, কালীচরণ ও তাহার ভ্রাতাকে ভূতল হইতে উঠাইয়া নানারূপ প্রবোধ বাক্যে শান্ত করিলেন।

জ্যেষ্ঠ বলিলেন, কালী! ভগ্নী ও পুত্র শোক আমি সহ্য করিতে পারিব, কিন্তু তুই ধর্ম্মচ্যুত হইয়া আমাকে ত্যাগ করিলি! এই অসহনীয় বিচ্ছেদশোক আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না। কালী তোর বিচ্ছেদে আমার এই অবস্থা, বৃদ্ধা মাতার অবস্থা ইহা অপেক্ষাও শোচনীয়। ভাই! ফিরিয়া বাড়ী চল, তুই বল, আমি খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হই নাই।"

কালীচরণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, দাদা, যেমন স্থির জলাশয়ে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইলে, সমস্ত জল আলোড়িত হয়, তদ্রূপ আমার প্রশান্ত হৃদয় ভগ্নী ও ভ্রাতুষ্পুত্রের শোকাঘাতে তরঙ্গিত হওয়ায়, আমি বিচলিত হইয়া সংসারত্যাগের বাসনা করিয়াছিলাম এবং কিরূপে সংসার বন্ধন ছিন্ন করতঃ পরিণামে অনন্ত জীবন পাইব, সেই চিন্তায় আকুল হইয়াছিলাম। পরিশেষে প্রভু যীশু খ্রীষ্টে আত্ম সমর্পণ করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছি। আমার জন্য আপনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না; ফিরিয়া ঘরে যাউন। আমি আপনার সেই ভ্রাতৃবৎসল স্নেহের ভ্রাতাই আছি। ইহজগতে পূর্ব্ববৎ প্রেমবন্ধনে উভয়ে আবদ্ধ থাকিব। কেবল-মাত্র পরিণামের মুক্তিমার্গ স্বতন্ত্র গৃহীত হইল।

জ্যেষ্ঠ অনেক কান্দিলেন, কালীচরণকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইতে পারিলেন না। তখন তিনি বিফলকাম হইয়া কান্দিতে কান্দিতে ভগ্ন হৃদয়ে মিশন হাউস হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পূর্ব্ব ঘটনাবলি যুগপৎ দেবীচরণের মনে পড়িয়া গেল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে ভাবিলেন, উঃ! সন্ন্যাসী খুল্লতাতের ভবিষ্যৎ বাণী—

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বাতুলের ন্যায় প্রকাশ্যে বলিলেন,—

শ্যামা মার বরপুত্র তুমি দেব-দূত,
জন্ম নিলে অবনীতে হয়ে নরসুত।
ভ্রাতৃভাবে অতি যত্নে রেখেছিনু তোকে,
তোমা হারা হয়ে এবে ডুবিলাম শোকে।

শ্রীবিপ্রচরণ বসু।

* মিশন হাউস—১৯ নং ডফ ষ্ট্রীট অধুনা যে স্থানে (United Free Chnrch Girls' School) বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত।

গীতার ব্যাখ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

লও জীব চিরকাল আমার শরণ ;
দূরে যাবে ভব-ভয় পাবে পরিত্রাণ।

এই দুইটী পংক্তিই গীতার মূল মন্ত্র ও চরম শিক্ষা। এই মন্ত্রটী ভারতনারী নিবিষ্ট ভাবে ও ভক্তিবিপ্লুত হৃদয়ে জপ করিলে বুঝিতে সক্ষম হইবেন, এই পৃথিবীতে ধন জন এ সকল অস্থায়ী। ব্রহ্মকৃপাই জীবের একমাত্র সহায় ও সম্বল। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁহারি অনন্ত কৌশলের ক্রীড়াভূমি। মোহাচ্ছন্ন মানবকে প্রকৃতি সহস্রবার অসংখ্য সঙ্কেতে সেই ভবের কাণ্ডারীর শরণ লইতে মনকে উত্তেজিত করে। ভক্তের অতি সামান্য উপহারও ভগবান্ প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন।

আমি সহজে মিলিত হই, পাপীর সনে
যদি ডাকে একবার কাতর প্রাণে।
অহঙ্কারী পাপী যারা
আমার দেখা পায়না তারা।
দীনজনের বন্ধু আমি সকলে জানে।

ভগবান্ এই উক্তি দ্বারা পাপীকে অভয় দিয়া থাকেন। প্রভু অধম সন্তানকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না। জগাই মাধাই তাহার দৃষ্টান্ত। আমরা যতই হীন হইনা কেন, তাঁহার সুশীতল অভয়বাণী ঘোর বিপদসাগরেও ভক্ত মানবের জীবনতরণী সুপথে চালিত করে। ঘোর পাপের আবর্জ্জনায় যখন লুণ্ঠিত হইয়া ও অকূল সলিলে ডুবিয়া প্রাণ মৃত হয়, তখন কাহার অনন্ত শক্তি পাপীকে সংসারের কর্দ্দম ধৌত করিয়া স্বর্গের পথে চলিতে বলীয়ান্ করেন, সহস্র পাপে জীবন কলঙ্কিত হউক না কেন, আমরা অভূতপূর্ব্ব চেতনা লাভ করিয়া ধন্য হই ইহাই ঈশ্বরের বাণী।

গীতা পাঠের উপকারিতা ভারত নারীগণের মনে উদ্দীপ্ত করিবার আশায় আমি সংক্ষেপে গীতার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিলাম। ভারতনারী পুরাকাল হইতে ধর্ম্মপ্রবণহৃদয়া বলিয়া বিখ্যাত আছেন, জ্ঞান সভ্যতার আলোকে সেই গুণ বিসর্জ্জন না করিয়া বর্দ্ধিত করিতে প্রাণ মনের সহিত যত্নশীলা হউন, এই আমার অন্তরের প্রার্থনা।

আর্য্যদিগের রন্ধন-শালা ও ভোজনস্থানাদি।

যৎকালে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আর্য্যদিগের রন্ধন বিদ্যার উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল, তৎকালের আলোচ্য রন্ধন-নিয়ম সমুদায় বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমরা সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পাই যে, রন্ধনগৃহাদি নির্ম্মাণ, ভোজনস্থান নির্দ্দেশ ও পাকপাত্রের নির্ব্বাচন প্রভৃতি বিষয়েও তাঁহাদের অনেকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম

ছিল। ভবনস্থ স্থানসমূহের মধ্যে রন্ধন-গৃহ নির্ম্মাণেরও একটী দিক্ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। অবস্থাপন্ন গৃহস্থগণ বিশেষতঃ নৃপতিগণ এই নিয়ম পালন বিষয়ে যথোচিত যত্ন করিতেন। কোন্‌দিকে কোন্ গৃহ নির্ম্মাণের বিধি ছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক পাঠে অবগত হওয়া যায়;—

"প্রাচ্যাং দিশি স্নানগৃহমাগ্নেয্যাং
পচনালয়ম্।
"শয়নং যাম্যদিগ্‌ভাগে নৈর্ঋত্যাং
শস্ত্রমন্দিরম্।
প্রতীচ্যাং ভোজন-গৃহং বায়ুভাগে সভাগৃহম্॥"
(ইত্যাদি মুহূর্ত্তচিন্তামণিটীকায়াং
কশ্যপবচনম্।)

অনুবাদ। পূর্ব্বদিকে স্নানগৃহ, অগ্নিকোণে রন্ধন শালা, যাম্যদিগ্‌ভাগে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে শয়ন গৃহ, নৈঋতকোণে অস্ত্রালয়, পশ্চিমদিকে ভোজনগৃহ, ও বায়ুকোণে সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিবে।

উল্লিখিত শ্লোক পাঠে বোধ হয় যে, পাকশালা ও ভোজনশালা এক ছিল না, অর্থাৎ যে গৃহে রন্ধন করা হইত, সেই গৃহে বসিয়া ভোজন করিবার নিয়ম ছিল না। বর্ত্তমান সময়েও অনেক সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের ভবনে এই নিয়ম প্রতিপালিত হইতে দেখা যায়। একই গৃহে রন্ধন ও ভোজন হইলে ভোজনাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট পিপীলিকাদি কর্ত্তৃক নীত হইয়া তৎসংস্পর্শে খাদ্যবস্তুর পবিত্রতার নষ্ট হইতে পারে। রন্ধন গৃহটী সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা গৃহস্থের একান্ত কর্ত্তব্য। রন্ধনগৃহে একেই অগ্নির উত্তাপাদি বর্ত্তমান থাকে, ইহার উপর আবার ভোজনার্থে তথায় বহুলোক সমাগত হইলে তাহাতে উত্তাপাধিক্য ও নিশ্বাস প্রশ্বাস জনিত বায়ু দুষ্ট হইতে পারে। যেখানে স্ত্রীলোকেরা রন্ধন করেন, সেখানে তাঁহাদিগের স্বাধীন ভাবে থাকিবার নিয়মই ভাল। হয়ত, কখনও কার্য্যব্যগ্রতা প্রযুক্ত মহিলাদিগের অসাবধানতা ঘটায়, লজ্জাশীলতারও ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। এ জন্যও পাকগৃহ এবং ভোজনগৃহ পৃথক্ থাকা ভাল। বোধ হয় এবম্বিধ আরও অনেক যুক্তির দিকে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রকারগণ রন্ধনগৃহ ও ভোজনগৃহ পৃথক্ রাখিবার জন্য সাধ্যপক্ষে সকলকে যত্ন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

বঙ্গদেশের অধিকাংশ পল্লিগ্রামে সাধারণ গৃহস্থের ভবনে যদিও রন্ধনগৃহ ও ভোজনগৃহ প্রায় পৃথক্ ভাবে নির্দ্দিষ্ট নাই, তথাপি সেই স্থানের পবিত্রতার দিকে বিশেষ লক্ষ্য আছে। অশিক্ষিত গৃহস্থেরও সংস্কার আছে, রন্ধনগৃহে অবশ্য একাধিক জানালা রাখা চাই। আবার পাকশালায় যেখানে রন্ধন হয়, সেই স্থানটি মৃত্তিকাদি দ্বারা মেজে অপেক্ষা একটু উচ্চভাবে নির্ম্মাণ করা হয়। সেই দিকে জলের কলসী রাখিবার জন্য মৃত্তিকা-নির্ম্মিত উচ্চ পীঠ শৃঙ্খলতার সহিত নির্ম্মিত হইয়া থাকে। আমাদের পাঠকপাঠিকাগণ উহা সকলেই দেখিয়াছেন, সুতরাং উহার বিস্তৃত বর্ণনা অনাবশ্যক।

উক্ত নিয়মে রন্ধনগৃহের রন্ধনস্থান পৃথক্ থাকাতে বোধ হয় যে, পাক স্থান ও ভোজনস্থান একই গৃহে হইলেও যেন উক্তরূপ বিধিবিশেষ দ্বারা দুইটী পৃথক্ গৃহের অনুকল্পভাব রক্ষিত হয়। যাঁহাদের অবস্থা ভাল নহে, এজন্য নগরে দুই তিনটীমাত্র কুঠুরি ভাড়া করিয়া বাস করেন, তাঁহাদের গৃহের প্রাচুর্য্যের সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং রন্ধনগৃহ ও ভোজনগৃহ পৃথক্ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায় বুঝিয়া, সাধ্যপক্ষে উক্ত উভয় গৃহ যথাসম্ভব পৃথক্ রাখাই ভাল।

(ক্রমশঃ)।

বিধবা-বিবাহ।

বহুদিনের বহু পুরাতন কথা আজি আমরা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। কেননা শ্রীযুক্ত অশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা বালিকা কন্যার বিবাহোপলক্ষ্যে হিন্দু সমাজ-সমুদ্রে যে স্রোতঃ ছুটিয়াছে, তাহাতে অন্য নূতন বিষয় অবতারণা অপেক্ষা "বিধবা-বিবাহ"-রূপ পুরাতন বিষয় আলোচনা করার প্রয়োজনটা অত্যন্ত অধিক দেখিতেছি।

হিন্দুসমাজে স্থিতিশীল এবং উন্নতিশীল এই দুই সম্প্রদায় আছেন। উভয়পক্ষই সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; সমাজের মঙ্গলসাধনই উভয় পক্ষের প্রাণগত কামনা। তবে উভয় পক্ষ ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী। যাহা আছে তাহাই থাকুক; নূতন রীতি নীতি সংস্পর্শে সমাজ বিশৃঙ্খল হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ বিধ্বস্ত হইবে, অতএব যাহা কিছু ত্রুটি, যাহা কিছু ভ্রম, যাহা কিছু দোষ তাহা সংশোধন না করিয়া পুরাতন জীর্ণ রোগের মত নীরবে বহন করাই কর্ত্তব্য; এইরূপ বিবেচনায় পুরাতন প্রথা সকল রক্ষা করা, এবং নূতন প্রথা হইতে সমাজকে বিযুক্ত রাখা ইহাই স্থিতিশীল দলের কার্য্য। আর সমাজের যাহা অহিতকর, তাহার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন এবং যাহা কল্যাণকর তাহার গ্রহণ ও প্রচলন, সর্ব্বতোভাবে জীর্ণ সংস্কার করা—ইহাই উন্নতিশীল দলের কার্য্য। এই দুই সম্প্রদায়েই এদেশের কৃতবিদ্য, প্রাজ্ঞ, মনস্বী ও সহৃদয় মহাশয়গণ আছেন; সুতরাং এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্য ও মঙ্গল নিহিত আছে একথা বলা বাহুল্য মাত্র। আমি এই সকল মহাত্মাগণের চরণ বন্দনা করিয়া, নিজের অযোগ্যতা সত্ত্বেও ইঁহাদিগের বল ভরসার আশ্রয় লইয়া, যাহা বলিবার তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। যাঁহারা সমাজ ও সাহিত্য—সেবাব্রতে আমার গুরু তুল্য, আমার পথপ্রদর্শক, তাঁহাদের উজ্জ্বল আলোকে আমি নিজের সমস্ত অন্ধকারটা মিলাইয়া দিতে পারিব, এই রকম আশা করিতেছি।

আর্য্য ভারতে ঋষিগণই সমাজের শিক্ষক

ও পরিচালক ছিলেন। তাঁহাদের আদেশ ও উপদেশ সমূহকে শাস্ত্র বলা হয়। হিন্দু জাতিকে শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য করিতে হয়। জন্ম মৃত্যু বিবাহাদি সংস্কার হইতে দৈনিক কার্য্যও শাস্ত্রানুসারে নির্ব্বাহ করা হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপে যে ঋষিগণ প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের জীবনের সকল কার্য্যের নিয়ন্তা স্বরূপ, সেই শাস্ত্রকার ঋষিগণের প্রকৃতি ও কার্য্য পর্য্যালোচনা করা আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তাঁহারা যে কি প্রকার বিরাট পুরুষ ছিলেন, তাঁহাদের জনহিতৈষণা যে কি প্রকার সার্ব্বভৌমিকী ছিল, তাহা আজি শাস্ত্রীয় প্রমাণ হইতে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এ বিষয়ে বঙ্গভূমির কোন সুপ্রসিদ্ধ লেখক কিছুদিন পূর্ব্বে "বঙ্গদর্শন" পত্রে যাহা লিপিবদ্ধ করেন, আমরা তাহা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

"আমাদিগের ধর্ম্ম মানব ধর্ম্ম; মানবের ক্রমোন্নতি লাভেই তাহা আত্মতৃপ্ত হইয়া সাফল্য লাভ করে। সে ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে হইলে পরকে আপন করিতে হয়, ভেদবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিতে হয়; নরনারীর কল্যাণকামনায় আপনায় ক্ষুদ্র স্বার্থ বিস্মৃত হইতে হয়। বাহুবলে প্রাচ্য সভ্যতা বিস্তৃত হইতে পারে না। তাহা পাশব ধর্ম্ম বলিয়াই পরিচিত। ব্রাহ্মণ (ঋষিগণ) মানব ধর্ম্ম বিস্তার করিবার জন্য সর্ব্বভূতের কল্যাণ কামনায় দীর্ঘ তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তপঃসিদ্ধ ব্রাহ্মণ যখন উদার নীতির উপদেশ বিতরণ করিতেন, তখন জনসমাজ তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হইতে পারিত।"

এই সকল মহামহিম ঋষিগণ প্রদত্ত উপদেশানুসারে চলিতে পারাই জীবনের সার্থকতা। যাহা হউক, ঐ প্রবন্ধের অন্যত্র লিখিত আছে, "ব্রাহ্মণ (ঋষিগণ) মানবজীবনের ক্রমোন্নতি লাভের যে সকল পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া, পুরাতন ভারতবর্ষের শিক্ষাগুরু হইয়া ইতিহাসে আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার প্রথম সূত্র 'অথাতোঽধিকারঃ।' অথ—অতঃপর—অতঃ—এইজন্য—অধিকার—বিচার, অধিকার বিচার না করিয়া সকল শ্রেণীর নরনারীকে একই প্রকার উপদেশে শিক্ষা দান করা অসম্ভব।

ক্রমশঃ।

নূতন সংবাদ।

১। ইংলণ্ডেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ড রুষসম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত শীঘ্রই রুষিয়া যাত্রা করিবেন। রুষিয়ার উপস্থিত অরাজকতা স্মরণ করিয়া তত্রস্থ লোকেরা তাঁহার রুষ গমন যাহাতে রাজকার্য্য কিম্বা সাধারণ না হয় তজ্জন্য আবেদন করিয়াছেন।

২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ-এ

ও বি-এ পরীক্ষায় যে সকল ছাত্র এবৎসর উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই, তাহাদের যাহাতে আগামী বর্ষের নূতন নিয়ম অনুসারে পরীক্ষা দিতে না হয়, সে জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা আগামী ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুত্তীর্ণ ছাত্রদিগের জন্য একটী বিশেষ পরীক্ষা করিবেন। এই সময়ের মধ্যে অনুত্তীর্ণ ছাত্রদিগের প্রস্তুত হইবার জন্য অনুরোধ।

৩। জাপান হইতে কৃষিবিভাগের দুই জন কর্ম্মচারী ভারতে আগমন করিয়াছেন এবং সিমলায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা ভারতে কৃষি, রেলপথ ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিবেন।

সাধুদৃষ্টান্ত। এবার দোলযাত্রায় কাশীধামের ছাত্রেরা সভা করিয়া স্থির করিয়াছিল, যে, এবার হইতে হোলি মহোৎসবে লোকের উপর ময়লা নিক্ষেপ করা এবং অশ্লীল গান বা তামাসা করা প্রভৃতি কুপ্রথা একেবারে রহিত করিতে হইবে। তাহারা কার্য্যতঃ তাহাই করিয়াছিল। এই সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহারা অপরকেও ঐ কুপ্রথা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিল। তাহারা শুধু গুলাল, চন্দন ও গোলাপ নিক্ষেপ করিয়াছিল, এবং অশ্লীলগানের পরিবর্ত্তে, সুন্দর সুন্দর ঈশ্বরস্তোত্র, পুণ্যশ্লোকগণের গুণানুকীর্ত্তন গান করিয়াছিল।

পাতিয়ালার নবীন মহারাজ, নিজ শুভ বিবাহ উৎসবে বারবনিতার নৃত্য ও সুরাপান প্রভৃতি কুপ্রথা নিষেধ করিয়াছেন। ঈশ্বর নবীন মহারাজকে দীর্ঘজীবী করুন।

আশ্চর্য্য সৎসাহস।—২৪শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৭ টার সময় শ্রীরামপুরে ১৪ বৎসরের একটী বালিকা সঙ্গিনীদের সঙ্গে বাটীর নিকট খেলা করিতে করিতে অসাবধানতা বশতঃ কূপমধ্যে পতিত হয়। সেই দুর্ঘটনায় তাহার সঙ্গীনীরা, মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়েরা হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু সন্ধ্যার সময় সেই গভীর কূপে নামিতে কাহারও সাহস হইল না। তাহাদের চিৎকারে মন্মথনাথ রায় চৌধুরী নামক এক যুবা তথায় উপস্থিত হইল, এবং ব্যাপার শুনিয়াই কূপের মধ্যে নামিয়া দেখিল, ঐ বালিকা বিশেষ আঘাত পায় নাই। সে বালিকাকে বলিল, তুমি দৃঢ়রূপে আমার কোমর জড়াইয়া ধর, এই বলিয়া সে বালিকাকে লইয়া অতি সাবধানে কূপের এক একটী পাঠ আশ্রয় করিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের ভারে যেই একটী পাট খসিয়া পড়ে অমনি যুবক বিদ্যুতের বেগে অপর পাট ধরিয়া আত্মরক্ষা করে। এইরূপে সেই বীর যুবক, বালিকাকে লইয়া নিরাপদে উঠিল। সেই বালিকার বিধবা মাতা শোকে সংজ্ঞাশূন্যা ছিলেন। তিনি যেন পুনর্জীবন লাভ করিলেন। ঈশ্বর ঐ ধর্ম্মবীর যুবককে চিরকুশলে রাখুন। ঐ যুবককে যথোচিত পুরস্কৃত করা সাধারণের কর্ত্তব্য।

বামারচনা।

নব বর্ষের নব সূর্য্য দর্শনে।

নব দেহ নব কলেবর,
উঠ দেব কাশ্যপকুমার!
লোহিতাঙ্ক নবীন জীবন
মহাদ্যুতি জগত আধার!
ঝলমলি রতন কুণ্ডলে
পুষ্পহার পর ঐ গলে।
সাজ দেব! বিশ্ব বিমোহন
জাগাও এ বিশ্ব কুতুহলে!
যোড় করে অদিতিনন্দিনী
দাঁড়াইয়ে তোমার চরণে,
সাজাইতে চরণ দুখানি
কত ফুল তুলেছে যতনে।
গাহিতেছে বিহঙ্গ মঙ্গল,
উঠাইয়া চৈতন্য লহরী,
ছুটাছুটী করিছে কেবল,
[illegible] তোমায় নেহারি।

ছড়াইয়া তোমার কিরণে
কত মধু ধরিয়াছে বুকে।
রেখেগেছে দেবতা সকল,
পূর্ণ করি সহস্র কলসী
সারি সারি শিশিরের জল,
স্নান হেতু তোমাকে সম্ভাষি।
ঐ দেখ সপ্তাশ্ববাহন,
সপ্ত অশ্ব হয়েছে যোজিত
লয়েছেন অরুণ আসন
রথোপরি হয়ে সুসজ্জিত।
কমলিনী নিদ্রা পরিহরি,
উঠিয়াছে সকলের আগে,
দেখিবারে ওরূপ মাধুরী
হাসিমুখ নব অনুরাগে।
পতিব্রতা পতিশয্যা ছাড়ি
সসম্ভ্রমে উঠেছে সকলে,
স্বামী অগ্রে, নব আশাধরি
গৃহ কর্ম্ম করিবেক বলি।
[illegible] গান,

মহাকাল, মহাদ্যুতি তুমি,
জ্যোতিঃপতি তেজের আধার,
স্বর্গ মর্ত্ত্য সর্ব্বস্থানগামী
ক্ষুধা তৃষ্ণা তোমাতে বিস্তার।

তুমি সত্য, তুমি যম, কাল,
সৃষ্টি-স্থিতি-পালনের পতি,
গতি মুক্তি তুমি, সর্ব্বকাল,
দিনক্ষণ কলাকাষ্ঠা গতি।

ভীতা আমি, দাও তেজ মোরে,
সর্ব্বব্যাপী ওহে তেজময়!
বলহীনা কি করিতে পারে,
তুমি মোরে দাও গো অভয়।

মরি আজ দুর্ভিক্ষ-দাবানলে,
স্বামী, পুত্র, যায় কোথা ভাসি;
ভীতা সদা দুর্জ্জয় তাড়নে,
দীননাথ! রক্ষা কর আসি।

শ্রীমতী লীলাবতী জ্যোতিষী।

নব বৈশাখে।

নব বৈশাখের নবীন আহ্বানে,
জাগ জাগ অয়ি মাতঃ বসুন্ধরা!
প্রেমের আঁচলে মুছাও নয়ন,
বহিতেছে যেথা সদা খরধারা।

শুষ্ক ছিন্ন পত্র ধূলি অবসান,
লুপ্ত হলো হায় পুরাতন খানি;
সারা বর্ষ ভরে ছিল শোভামান
সংসারে অশেষ প্রণয় প্রদানি।

হের নব তরু মুঞ্জরিল শাখা,
তরুণ মুকুল বিকাশিল শোভা।
প্রকৃতির প্রাণ নব সুখে মাখা,
প্রকাশিল ফিরে সুকোমল বিভা।

ঝরে গেল ঐ কতি[illegible]

ঝরে গেলে উড়ে পুড়ে হয় ছাই,
ব্যথা জ্বালা সেথা চিহ্নমাত্র একা।
ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে সে তুলনা নাই,
কোথায় প্রলেপ বল সুধা মাখা।

কুলিশ আঘাতে দগ্ধ যে ভূমি,
হে বৈশাখ! তব চরণ পরশে।
সেথা কি কুসুম জাগাইবে তুমি,
মুমূর্ষু পরাণ রহে যে অবশে।

বজ্রদাহনের বিষম উত্তাপ,
হয় কি শীতল জীমূত বর্ষণে?
গভীর [illegible]

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 544. December, 1908.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৬ বর্ষ। ৫৪৪ সংখ্যা। { অগ্রহায়ণ, ১৩১৫। ডিসেম্বর, ১৯০৮। } ৯ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নূতন ছোট লাট—বঙ্গের ছোট লাট সার এণ্ড্রু ফ্রেজার বাহাদুর অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সার এডওয়ার্ড বেকার তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন।

মৃত্যু—৺ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র পঞ্জাবের একাউণ্টাণ্ট-জেনারল মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য ৩রা অগ্রহায়ণ, বুধবার, লাহোরে, ৪৫ বৎসর বয়সে নিউমোনিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর মধ্যে এই উচ্চ পদে তিনিই প্রথম অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান ও শোকসন্তপ্ত পরিবারকে শান্তিদান করুন।

চীনের সম্রাট্ সান্‌টিন কংহসু গত ২৯শে কার্ত্তিক শুক্রবার দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। বৃদ্ধা রাজমাতা অনেক দিন হইতেই পীড়িতা ছিলেন, পুত্রের মৃত্যুসংবাদের দুই দিন পরেই শোকাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। রাজপুত্র চুন স্বীয় দুই বৎসরের পুত্র পুইকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ছোট লাটের প্রাণনাশের চেষ্টা—কলিকাতা ওভারটুন হলে বক্তৃতার সময় একটী যুবক বঙ্গের ছোট লাট বাহাদুরকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িয়াছিল, কিন্তু বন্দুক খারাপ থাকায় গুলি বাহির হয় নাই, এবং আসামী গ্রেপ্তার হইয়া দশ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

কংগ্রেসের সভাপতি—শুনা যায় মাননীয় ডাক্তার রাসবেহারী ঘোষ মহাশয় আগামী জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে সভাপতির পদ গ্রহণ করিবেন।

বিহারে অশান্তি—শুনা যায়, বিহারে অনেক প্রজা নীলের চাষ পরিত্যাগ করিয়া ইক্ষুর চাষে মনোনিবেশ করিয়াছে এবং

অনেকে আর মালিকের দেব কার্য্য করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এই উপলক্ষে অনেক প্রজাকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে।

নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি—ভারতে দেবোত্তর সম্পত্তি নামে দেবসেবা, অতিথি-সেবা ও শিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা গচ্ছিত আছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে সে সকল টাকার সদ্ব্যবহার না করিয়া অশিক্ষিত লোকেরা নিজেরা ব্যয় করিয়া থাকেন। ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় এই সকল দেবোত্তর সম্পত্তির রক্ষার জন্য এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন।

আয়র্লণ্ডে সুব্যবস্থা—আয়র্লণ্ডের ইংরাজ জমিদার এবং আইরিস প্রজাদিগের মধ্যে প্রায় অশান্তি ও গোলযোগ বাধে। গবর্ণমেণ্ট সেই জন্য আইন করিয়া ইংরাজ জমিদারদিগকে বাধ্য করিয়া আইরিস-দিগের নিকট তাহাদের জমিদারী বিক্রয় করাইতেছেন।

প্রতিবাদ সভা—দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদিগের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য টাউনহলে ভারতের সকল সম্প্রদায় মিলিত হইয়া এক বিরাট সভা করিয়াছিলেন। ভূপালের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর মৌলভি আব্দুল জব্বর সিমনই সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দান—বাবু সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার পিতামহ সুপ্রসিদ্ধ ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের স্মরণার্থ এলবার্ট ভিক্টর হাঁস-পাতালে একটী রোগীর বাসের জন্য ৩০৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ভক্তকবি তুলসীদাস।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

তুলসী নিজ পত্নীকে আপন ভবসাগর-পারের সহায় ও প্রথম গুরু বলিয়া উল্লেখ করিতেন, কেননা, প্রথমে পত্নীর ভর্ৎসনায় তাঁহার মনে বৈরাগ্যোদয় হয়। পত্নীর সেই তীব্র ভর্ৎসনাবাক্য তীক্ষ্ণধার কুঠারের ন্যায় তাঁহার মায়া-তরুর মূলে পতিত হইয়াছিল। তিনি সে কথা সর্ব্বদা স্মরণ করিতেন এবং পত্নীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। পতির সন্ন্যাসগ্রহণের পর তুলসীপত্নী অনুতাপে ও শোকে জীবন্মৃতা হইয়া পিত্রালয়ে বাস করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক দেহপাত করিয়াছিলেন। কথিত আছে সন্ন্যাসগ্রহণের বহুদিন পরে, তুলসী ঘটনাক্রমে শ্বশুরালয়ের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। সেই সংবাদ পাইয়া তাঁহার পত্নী দ্রুতপদে আসিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। তাঁহার দেহ এরূপ শীর্ণ হইয়াছিল যে, তুলসী প্রথমে চিনিতে পারেন নাই। পরে তাঁহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক ইষ্টমন্ত্র দান করেন। তুলসীপত্নী তদবধি অপূর্ব্ব

শান্তিময় নব জীবন লাভ করিয়া অবশিষ্ট জীবন পরানন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

বজ্রলেপঘটিত সুদৃঢ় মায়া পাশ ছেদন করিয়া, অটল গিরিরাজের ন্যায় কৈবল্য-পথে দণ্ডায়মান হইবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তুলসী গৃহত্যাগ করেন। তিনি সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছিলেন, সংশয় নাই। সে সময় তিনি আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"তুলসী যব্ জগমে আয়ো, জগ্ হসে তোম্ রোয়্।
আইসে কর্ণি কর্ চালাকি, তোম্ হসো জগো রোয়॥"

—হে তুলসী! তুমি যখন জগতে আসিয়াছিলে (মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলে), তখন (সূতিকাগৃহে তোমাকে দেখিয়া) সকলে (আনন্দে) হাসিয়াছিল, কিন্তু তুমি রোদন করিয়াছিলে। এখন তুমি এমন কার্য্য করিয়া যাও যে, (তোমার প্রস্থানকালে) সকলে রোদন করে, আর তুমি হাসিতে হাসিতে যাইতে পার।

সত্য সত্যই তুলসী জগৎকে কাঁদাইয়া, স্বয়ং পরমানন্দে আনন্দধামে প্রস্থান করিয়াছেন। বিশ্ববাসীর চিরকৃতজ্ঞ হৃদয়ে যিনি নিত্য জাগরূক, তিনিই জীবিত, তিনিই অমর।

উল্লিখিত হইয়াছে, হনুমান্ তুলসীকে বলিয়াছিলেন—তোমার ঐকান্তিকী ভক্তির প্রভাবে তুমি বারংবার ভগবান্ রামচন্দ্রের দর্শন লাভ করিবে। হনুমানের সে আশ্বাস-বাণী সফল হইয়াছিল। সাধনার প্রথমাবস্থায় তুলসী বহুদিন রমণীয় চিত্রকূটে বাস করিয়াছিলেন। একদা তত্রত্য মন্দাকিনী নদীতে প্রাতঃস্নান করিয়া, তিনি চন্দন ঘর্ষণ করিতেছেন ও মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন, ইত্যবসরে এক অপূর্ব্ব শ্যামমূর্ত্তি শিশু তথায় উপস্থিত হইয়া অমৃতায়মানকণ্ঠে কহিল,—বাবাজি! আমি আপনাকে চন্দন মাখাইতেছি। তুলসী কহিলেন,—আচ্ছা। শিশু পরম যত্নে তুলসীকে চন্দন মাখাইতে লাগিলেন। সেই শিশু যে ছদ্মরূপী স্বয়ং রামচন্দ্র, তুলসী তাহা বুঝিতে পারেন নাই, কেননা সে করকমলের স্পর্শমাত্রই কি এক অপূর্ব্ব আনন্দনির্ভরে তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় বিমূঢ় হওয়ায় বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল। হনুমান্ অলক্ষ্যভাবে তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভাবিলেন,—এ সময় উহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে হইবে, এ অবসর চলিয়া গেলে, হয়ত আর ঘটিবে না। হনুমান্ তখন শুক-পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া সমীপস্থ বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া সুব্যক্ত স্বরে কহিলেন,—

"চিত্রকূটকে ঘাটপর ভৈঈ সন্তনকী ভীর।
তুলসীদাস চন্দন ঘিসে, তিলক দেত রঘুবীর॥"

—অহো! আজি চিত্রকূটের ঘাটে, ভক্ত সন্তানের কি শুভদিন! তুলসীদাস চন্দন ঘষিতেছেন, রঘুবীর তাঁহাকে চন্দনের তিলক দিতেছেন!

হনুমান দুই তিন বার ঐ শ্লোক পাঠ করিলে, তুলসীর চৈতন্য হইল। তিনি

জানিলেন,—ইনিই রামচন্দ্র। তখন তিনি ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া ভগবানের চরণে পতিত হইয়া বাষ্পগদগদকণ্ঠে স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান করিলেন। তখন হনুমান্ তুলসীর নিকট আসিয়া কহিলেন,—হে ভক্ত সাধো! ভগবান্ তোমার ভক্তি-ডোরে বদ্ধ হইয়াছেন, তুমি বারংবার তাঁহার দর্শন পাইবে, এবং আমিও প্রয়োজনমত আসিয়া তোমার সহায়তা করিব।

তুলসীদাস একদা ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে আশ্রম হইতে বহুদূর গমন করিলেন। বনপথ দিয়া যাইতে যাইতে ক্রমে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে দেখিলেন,—অদ্ভুতমূর্ত্তি অসংখ্য বানর ও রাক্ষস সমবেত। তথায় মহাসমারোহে বিভীষণের রাজ্যাভিষেক মহোৎসব হইতেছে। তিনি অবাক্ হইয়া ঐ দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। ভাবিলেন,—তন্তত্য লোক সকল সমবেত হইয়া আশ্চর্য্য বেশভূষা করিয়া এ স্থানে রামলীলা করিতেছে। অহো! কি আশ্চর্য্য অভিনয়! অভিনয় এত সত্য, এত অবিকল হইতে পারে, তাহা জানিতাম না। তিনি ঐ অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার ভাবিতে ভাবিতে নিজ আশ্রমাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া কহিলেন;—অহো! কি আশ্চর্য্য রামলীলা দেখিলাম! আপনি কি এ রামলীলা দেখিয়া আসিলেন? ব্রাহ্মণী বিস্মিত হইয়া কহিলেন;—গোঁসাইজি! আপনি দেখিতেছি, ক্ষেপিয়াছেন। রামলীলা আশ্বিন মাসে হয়, এসময় রামলীলা কোথায়? তুলসী কোনও উত্তর না করিয়া, হনুমানের বাক্য ও ভগবানের অচিন্ত্য লীলারহস্য ভাবিতে ভাবিতে, চিত্রকূট হইতে অযোধ্যা যাত্রা করিলেন।

তুলসী যে সকল খাদ্যাদি উপহার পাইতেন, তাহা অতিথি, অভ্যাগত, দীন-দরিদ্রগণকে দান করিতেন। যাহা অবশিষ্ট থাকিত, পরদিনের জন্য রক্ষা করিতেন। ৺কাশীধামে চোরের ভয়ানক উপদ্রব। একদিন গভীর অন্ধকাররাত্রে তাঁহার আশ্রমে চোর আসিয়াছিল। চোর তাঁহার গৃহমধ্যে যেই প্রবেশ করিবে, অমনি সম্মুখে দেখিল,—এক তেজঃপুঞ্জ অপূর্ব্ব শ্যামবর্ণ পুরুষ ভীষণ ধনুর্বাণ হস্তে সম্মুখে দণ্ডায়মান! তদ্দর্শনে সে ভয়ে বিহ্বল হইয়া, "রক্ষা করুন—রক্ষা করুন!" বলিয়া তুলসীকে আহ্বান করিতে লাগিল। তুলসী তাহার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া চোরকে অভয় দিয়া, এবং পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিয়া, বিদায় দিলেন। অনন্তর মনে মনে ভাবিলেন,—অহো! আমি কি মূঢ়! আমি এই তুচ্ছ দ্রব্যের জন্য প্রভুকে এত ক্লেশ দিতেছি! তদবধি তিনি ভাণ্ডারে কোনও দ্রব্যই পর দিনের জন্য সঞ্চিত রাখিতেন না, প্রত্যহ সমস্তই দান করিয়া ফেলিতেন।

আর একদিন ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথে তুলসী একাকী কাশীর এক গলি দিয়া আশ্রমে আসিতেছিলেন। এমন সময়ে ভীষণ দস্যুদল তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল,

তাঁহার প্রাণবধের জন্য অস্ত্র তুলিল। তুলসী একান্তভাবে হনুমান্‌কে স্মরণ করিলেন। পরক্ষণেই দস্যুগণের হস্তপদাদি অস্পন্দ হইল, মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিতে লাগিল। তাহারা কাতরভাবে প্রাণ ভিক্ষা করিতে লাগিল। তুলসী বলিলেন—যদি তোমরা শপথ করিয়া দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ কর, তবে তোমাদিগকে রক্ষা করিব। তাহারা তাহা স্বীকার করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। তদবধি তাহারা দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া সাধু জীবিকা অবলম্বন করিল।

তুলসী পরোপকারের সুযোগ পাইলে ছাড়িতেন না। তাঁহার যত্নে অসংখ্য দীনহীন অনাথের দুঃখমোচন হইয়াছিল। কোনও প্রবল ব্যক্তি দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিলে, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইতেন। তাঁহার এমনি আশ্চর্য্য প্রভাব! যে হিন্দু, মুসলমান সকলেই তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিত। ইহার কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

একদা তিনি জনকপুরে গিয়া শুনিলেন, পাটনার মুসলমান সুবাদার এক ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র বারখানি গ্রাম বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ সপরিবার অন্নাভাবে ঘোর দুর্দ্দশায় পড়িয়াছে। উক্ত বারখানি গ্রাম, ঐ ব্রাহ্মণেরা রামচন্দ্রের রাজত্বকাল হইতে ব্রহ্মত্ররূপে ভোগ করিয়া আসিতেছে। ঐ ব্রাহ্মণেরা তুলসীর আগমনবার্ত্তা পাইয়া, সপরিবারে তাঁহার শরণাপন্ন হইল। তুলসী সুবাদারের নিকট উপস্থিত হইলে, সুবাদার সসম্ভ্রমে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। তুলসী তাহাকে পার্থিব বৈভবের অসারতা ও অধর্ম্মাচরণের ভীষণ পরিণাম এরূপ মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় বুঝাইলেন যে, সুবাদার ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল। সে তৎক্ষণাৎ সেই ব্রাহ্মণকে আনাইয়া, তাহার পৈতৃক সম্পত্তি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিল।

জাহাঙ্গীর বাদসাহ পিতার নিকট এবং অন্যান্য লোকের নিকট তুলসীর অলৌকিক প্রভাব অবগত হইয়াছিলেন। তিনি তুলসীকে দেখিবার জন্য এরূপ ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে, স্বয়ং কাশীধামে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বাদসাহ তাঁহাকে প্রভূত সম্পত্তি দিতে চাহিলে, তুলসী তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন,—দয়াময় ঈশ্বর আপনাকে অসীম ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্ব দান করিয়াছেন। পরোপকারের জন্য এরূপ সুযোগ লাভ করা এ জগতে অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। আপনি সর্ব্বপ্রযত্নে প্রজারঞ্জন ও দীনপালন দ্বারা ঈশ্বরের এই দুর্লভ দানকে সম্পূর্ণ সার্থক করুন। আপনার বিশাল ধনাগারে যে সকল মহামূল্য মণিরত্ন আছে, সে সকলের অপেক্ষা নির্ম্মল দয়ার্দ্র হৃদয়কেই আপনি অধিক মূল্যবান্ জ্ঞান করিবেন। সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বরের অনন্ত দৃষ্টি আপনার উপর সর্ব্বদাই নিবদ্ধ। আপনি সমস্ত সংসারকে ফাঁকি দিতে পারেন, কিন্তু সে সর্ব্বসাক্ষীর দৃষ্টির নিকট আপনার কোনও চাতুরী খাটিবে না। সর্ব্বত্র সমতা ও শুভ দৃষ্টিই রাজধর্ম্ম। পক্ষপাতী, লোভান্ধ রাজার রাজ্য ছারখার হয়। প্রজার সুখসমৃদ্ধিই

রাজার অভ্যুদয়,—"লোকাধারাঃ শ্রিয়ো রাজ্ঞাম্।" সম্রাট্ জাহাঙ্গীর তুলসীর অলৌকিক সাধুতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছিলেন।

তুলসী একদা বিঠুর হইতে আসিতেছিলেন। পথে শণ্ডিলনামক স্থানে, এক ব্রাহ্মণ, পত্নীসহ আসিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন, এবং কাতর ভাবে কহিলেন,—প্রভু! আমরা পুত্রহীন। পুত্রের জন্য নানা দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও ফল পাইলাম না। তাই, বংশলোপভয়ে অতিমাত্র কাতর হইয়াছি। শুনিয়াছি, ভবাদৃশ সাধুর কৃপায় অসাধ্যও সিদ্ধ হয়। এ শরণাগত ব্রাহ্মণদম্পতীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন। তুলসী স্বহস্তে তাঁহাদিগকে দুইখানি রামকবচ লিখিয়া দিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক উহা ধারণ করিতে বলিলেন। আরও বলিলেন, "তোমরা শুদ্ধভাবে থাকিয়া সর্ব্বদা ভগবান্‌কে স্মরণ করিও। তোমাদের বংশ অক্ষয় হইবে এবং সকলেই রামভক্ত হইবে।" আরও বলিলেন,—"এক বৎসরের মধ্যে তোমাদের একটী সুসন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে, এবং সেই সন্তান পরম ভক্ত ও মহাকবি হইবে।" বাস্তবিক তাহাই হইল। ব্রাহ্মণদম্পতী সংবৎসরমধ্যে অপূর্ব্ব পুত্ররত্ন লাভ করিলেন। ঐ পুত্রের নাম বংশীধর; তিনি "কবীশ্বর বংশীধর" নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের বংশপরম্পরা অদ্যাপি বর্ত্তমান; সকলেই ভগবদ্ভক্ত, সুশীল ও আতিথেয়। ঐরূপ পর্য্যটনকালে তিনি জৈরামপুর নামক গ্রামের সন্নিহিত এক বিস্তীর্ণ মাঠ দিয়া যাইবার সময় দেখিলেন, অত বড় মাঠে একটীও বৃক্ষ নাই। গ্রীষ্মকালে তথায় পথিকদিগের বিশ্রামলাভের কোনও উপায় নাই। তত্রত্য লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন;—ঐ স্থানে বৃক্ষ রোপণ করিলে তাহা শুকাইয়া যায়, জলসেকও নিষ্ফল হয়। এই জন্য ঐ স্থান মরুভূমির ন্যায় পতিত রহিয়াছে। তিনি ঐ কথা শুনিয়া, একটী জীর্ণশীর্ণ বটশাখা লইয়া ঐ স্থানে স্বহস্তে রোপণ করিলেন। বলিয়া দিলেন;—"এই বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইলে, ইহার নাম "বংশীবট" রাখিও। প্রতি বর্ষে এই স্থানে রামলীলা উৎসব করিও।" স্বল্পকালেই সেই জীর্ণশাখা অপূর্ব্ব বৃক্ষে পরিণত হইল। সেই বংশীবট অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া অসংখ্য শ্রান্ত পান্থকে অমৃততুল্য ছায়া দান করিয়া পরিতৃপ্ত করিতেছে। প্রতিবর্ষে সেই স্থানে রামলীলা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

নীতিস্তবক।

১। মানুষের চক্ষুদুটী এমন স্থানে বসান আছে যে, মানুষ সকলেরি মুখ দেখিতে পায়, কেবল নিজের মুখ দেখিতে পায় না। অর্থাৎ অন্যের মুখে যে সব দোষ আছে, তাহাই দেখিতে পায়, নিজের মুখাকৃতির দোষ তাহার চক্ষে

পড়ে না। কিন্তু যাহার জ্ঞানচক্ষু আছে, সে অগ্রে নিজের দোষ দর্শন করে।

২। শাস্ত্রে আছে ;—"ধনানি জীবিতং চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ"—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরার্থে নিজ ধনপ্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। যে ব্যক্তি কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ঐরূপ আত্মবিসর্জ্জনে শিক্ষিত হয় নাই, তাহার নিকট শাস্ত্রের কথা উপকথা।

৩। ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস অটল, ঈশ্বর তাহার সঙ্গেই থাকেন। কোটি কোটি শত্রুও তাহার অনিষ্ট করিতে পারে না। সে অশেষ সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া জয়যুক্ত হয়। ঈশ্বর বিশ্বাসিগণের নিত্য সহায়।

৪। যাহার হৃদয় দয়ায় ও সরলতায় পূর্ণ, ঈশ্বর সর্ব্বদাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।

৫। যে ঈশ্বরকে পাইতে ইচ্ছা করে, তাঁহার অনুসন্ধান করে, সে অযাচিতভাবে সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য লাভ করে।

৬। ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্বের মধ্যে ঈশ্বরকে পাইবে না, পবিত্র আত্মার মধ্যে অনুসন্ধান কর, সে নিধি মিলিবে।

৭। মানবকে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ও চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল ও সুস্নিগ্ধ হইতে হইবে। অর্থাৎ তাহার তেজে পাপরাশি দগ্ধ ও তাহার প্রেমচন্দ্রিকায় জগৎ শীতল হইবে।

৮। সংসারের সমস্ত কার্য্যকলাপের মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত বিদ্যমান। বিশ্বাসী ব্যক্তি জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় ঈশ্বরের মঙ্গল-হস্তের চিহ্ন প্রত্যক্ষ করেন।

৯। ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন কোনও কার্য্য সিদ্ধ হয় না।

—"নহীশ্বর ঋতে চেষ্টিতং জগৎ"।

১০। কাহারও কোনও উপকার করিয়া, "আমি করিলাম"—এ অভিমান বৃথা। ঈশ্বরই করেন, তুমি—আমি নিমিত্ত-মাত্র।

১১। যে স্ত্রী আপনার স্বামীর মন সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে পারেন নাই, যাঁহার স্বামীর মন পরস্ত্রীদর্শনে আকৃষ্ট হয়, তিনি আপন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন নাই। ধর্ম্মপত্নী স্বামীর মন এতদূর অধিকার করেন যে, তাঁহার স্বামীর মন অন্যত্র আকৃষ্ট হয় না।

১২। ধর্ম্মগুরু কবীর বলিয়াছেন ;—পুত্ আর মুত্ এক স্থান হইতে আসিয়া থাকে। যে পুত্ পিতামাতার মুখ উজ্জ্বল না করে, সে পুত্ নহে, সে মুত্।

১৩। যে প্রভুকে তাহার অনুজীবিগণ ভক্তিশ্রদ্ধা না করে, যাহাকে আত্মরক্ষার্থ সদাই রক্ষিবেষ্টিত হইয়া থাকিতে হয়, সে প্রভু দস্যুমধ্যে গণ্য।

১৪। মানুষ কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া নিজেই নিজের মৃত্যুবাণ প্রস্তুত করে।

১৫। যাহার হৃদয় শিশুর ন্যায় কোমল ও সরল, যে ধরণীর ন্যায় সহিষ্ণু, গিরির ন্যায় অটল, তাহাকেই বীর বলে।

১৬। যে মানব সর্ব্বপ্রকার অবস্থার সহিত নিজ প্রকৃতির সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারে, সে কখনও অসুখী হয় না।

১৭। তোমার অন্তরের নিগূঢ়তম

স্থান ও সর্ব্বসাক্ষীর অগোচর নহে। আমার এ কার্য্য কেহ দেখিল না, যে মনে করে, সে বড়ই ভ্রান্ত।

১৮। মানবমাত্রেই ঈশ্বরের সেনা। সকলকেই সৈনিক হইতে হইবে। অধর্ম্মের সহিত যুঝিতে যুঝিতে যে সেই বিজয়লক্ষ্মী ঈশ্বরকৃপা অধিকার করিবে, সেই রণজয়ী বীর।

দেবী—না মানবী!

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মালব প্রদেশের সিংহাসনে এক ধর্ম্মশীলা হিন্দুমহিলা অধিষ্ঠিতা ছিলেন। তাঁহার নাম অহল্যা বাই। ভারতের অতীত ইতিহাসে যে সকল মহিলার পবিত্র কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে অহল্যাবাইয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মালবপ্রদেশের রাজা খণ্ডীরাওএর সহিত অহল্যাবাইএর বিবাহ হয়। কিন্তু স্বামিসুখভোগ তাঁহার ভাগ্যে বেশী দিন ঘটে নাই। পতির মৃত্যুর পরই একমাত্র পুত্র মালরাও অতি অল্প দিন মাত্র রাজত্ব করিয়া ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। মালরাওএর মৃত্যুর পর অহল্যা বাই স্বয়ং মালবের অধীশ্বরী হইলেন। পতি ও পুত্র হারা হইয়া তিনি কিছুকাল কন্যা মুক্তাবাইকে লইয়া শান্তির অন্বেষণে ব্যস্ত রহিলেন। কিন্তু শোকসন্তপ্ত হইয়াও এক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলে পর গঙ্গাধর যশোবন্ত নামক একজন রাজপুরোহিত তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। রাজপুরোহিত গঙ্গাধর অহল্যাবাইকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। ইনি ভাবিয়াছিলেন যে, দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলে তিনি স্বয়ং রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান হইয়া থাকিতে পরিবেন। কিন্তু অহল্যাবাই পুরোহিতের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। রাজ্যের যাহাতে প্রনষ্ট গৌরব ফিরিয়া আইসে যাহাতে রাজ্যে ধর্ম্ম সংস্থাপন হয়, এই চিন্তাই তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। তাই তিনি গঙ্গাধরের প্রস্তাবে বিনীত ভাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

এদিকে গঙ্গাধরের হৃদয়ে বিদ্বেষাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। মহারাষ্ট্রীয় রাজার পিতৃব্য রাঘব দাদাকে অহল্যা বাইয়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। গঙ্গাধরের পরামর্শে রাঘব শীঘ্রই অহল্যা বাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিলেন।

অযথা নর-রক্তপাতের আশঙ্কায় ধর্ম্মশীলা অহল্যা বাই একটু বিচলিত হইলেন এবং মহারাষ্ট্রের রাজা মধুরাওকে আপনার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া একখানি অনুরোধপত্র প্রেরণ করিলেন। মধুরাও আপন পিতৃব্য রাঘব দাদাকে নিরস্ত করায় যুদ্ধসজ্জা অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইল।

গঙ্গাধর যশোবন্ত বড়ই বিপদে পড়িলেন। অন্য উপায় না দেখিয়া তিনি পুনরায় অহল্যা বাইয়ের শরণাপন্ন হইলেন। অহল্যাবাই তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রিপদ প্রদান করিলেন। তকাজী হুলকার নামক অহল্যা বাইয়ের একজন বিচক্ষণ সেনাপতি ছিল। অহল্যা বাই স্বয়ং মহীশূরে থাকিয়া শাতপুরা পর্ব্বতের উত্তরস্থ প্রদেশ সকলের রাজস্ব আদায় করিতেন এবং তকাজী দক্ষিণ প্রদেশে থাকিয়া হুলকারের অধীনস্থ প্রদেশের রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন। এদিকে নিমাড়, মালব ও দক্ষিণ অঞ্চলের রাজস্বও তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইত।

অহল্যা বাই কখনই প্রজার রক্ত শোষণে ব্যস্ত ছিলেন না। তাই তিনি শ্রীহীন সামান্য গ্রাম ইন্দোরকে একখানি সমৃদ্ধিশালী প্রসিদ্ধ নগর করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের ব্যয়ের জন্য বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি দুই কোটি টাকা হুলকার রাজা হইতে পাইয়াছিলেন। এই সকল টাকাই তিনি সৎকর্ম্মে ব্যয় করিয়াছিলেন।

রাজকর্ম্মচারিগণ নিয়মিত বেতন পাইলে পর যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহা যুদ্ধবিগ্রহের নিমিত্ত সঞ্চিত থাকিত। ভারতবর্ষের সকল রাজার প্রতিনিধি আসিয়া রাজদরবারে উপস্থিত থাকিতেন এবং অহল্যা বাইয়ের প্রতিনিধিগণ হায়দ্রাবাদ, শ্রীরঙ্গপত্তন, পুণা, লক্ষ্ণৌ, কলিকাতা, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে থাকিয়া সেই সকল স্থানের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

অহল্যাবাই বহু অর্থব্যয়ে বিন্ধ্যপর্ব্বতের উপরে জাম নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করান। পরে ক্রমে ক্রমে আরও কয়েকটী দুর্গ তিনি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

রাজকার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে অহল্যা বাইয়ের বিশেষত্ব ছিল। তিনি রাজসভায় মন্ত্রিগণ ও পারিষদবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। হিন্দুমহিলার ন্যায় তিনি চব্বিশ ঘণ্টা অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকিতেন না। তাঁহার জীবনপ্রণালী অতীব শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। তিনি প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিয়া স্নানাদি সমাপনান্তে শিবপূজায় নিযুক্ত রহিতেন। পূজা আহ্নিক শেষ করিয়া কিছুকাল নিবিষ্টচিত্তে ধর্ম্ম-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। তৎপরে পাঠান্তে নিজ হস্তে কয়েকজন ব্রাহ্মণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া সর্ব্বশেষে স্বয়ং আহার করিতেন। আহারান্তে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া তিনি পরিচ্ছদে সজ্জিত হইতেন। বেলা আড়াই প্রহরের সময় রাজসভায় উপস্থিত হইতেন এবং সায়ংকাল পর্য্যন্ত রাজ্যের অভাব অভিযোগ বিচারান্তে সায়ংকৃত্য সম্পন্ন করিয়া রাত্রিকালীন ভোজন করিতেন। ভোজনের পরও তিনি কিছুকাল পুনরায় রাজদরবারে বসিতেন। "রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ" এই কথাটী রাণী অহল্যা বাইয়ের চরিত্রে সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছিল।

অহল্যা বাই ধর্ম্মশীলা ও অতি বুদ্ধিমতী ছিলেন। আর্ত্তের অশ্রুজল ও কাঙ্গালের হৃদয়বেদনা তিনি নিজ হৃদয়ে অনুভব করিতেন। তাঁহার ন্যায় দয়াবতী রমণী জগতে দুর্ল্লভ সন্দেহ নাই। তাঁহার স্থাপিত কীর্ত্তিসমূহ অদ্যাপি জগতে হিন্দুরমণী-চরিত্রের শ্রেষ্ঠতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। প্রতি বৎসর শত শত নর নারী হিন্দুতীর্থ কেদারনাথে প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ধর্ম্মসঞ্চয় করিতে গমন করিয়া থাকেন। অহল্যা বাই যাত্রীদিগের কষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত একটী ধর্ম্মশালা ও একটী কুণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মশালা আজিও মন্দরনামক স্থানের উত্তরাংশে পুণ্যবতী অহল্যাবাইয়ের চরিত্রচিত্রের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালা ও কূপ, মালব ও মহীশূর প্রভৃতি প্রদেশে অদ্যাপিও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার কীর্ত্তি হিন্দুতীর্থ—শ্রীক্ষেত্র, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, দ্রাবিড়, প্রভৃতি স্থানে শত শত যাত্রীর অভাব অভিযোগ দূর করিতেছে।

সর্ব্বাপেক্ষা গয়াতেই অহল্যাবাইয়ের প্রতিষ্ঠিত বহু দেবালয় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণু-পদ-মন্দির ও লাটমন্দির অদ্যাপি বিদেশীয় চিত্রকর-দিগের বিস্ময়াকর্ষণ করিতেছে। ইদানীন্তন যে সকল নব্য শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক মাতৃ-ভূমির অবমাননা করিয়া ভারতের কলা-বিদ্যার দরিদ্রতা সপ্রমাণ করিতে ব্যস্ত, তাঁহারা একবার—Indian Antiquary পাঠ করুন। প্রসিদ্ধ চিত্রকর গ্রিফিথ সাহেব ভারতের চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"When I saw long delicate carves drawn without faltering with equal precision upon the horizontal surface of ceiling, where the difficulty of execution is increased a thousand fold—it appeared to me nothing less than miraculous" (Indian Antiquary, Vol. III, p. 26.)

আমাদের নিজের দেশের খবর আমরা রাখিনা বটে—কিন্তু গুণগ্রাহী ইংরেজ-সমাজ সাত সমুদ্র তের নদীর পার হইতে আগ্রহ-ভরে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অহল্যাবাইয়ের প্রতিষ্ঠিত গয়ার বিষ্ণুপদ-মন্দির এবং লাটমন্দির দেখিলে অতীত গৌরবকাহিনী মানসপটে উদিত হইয়া নয়নপ্রান্তে আনন্দাশ্রুর সঞ্চার হয়। মন্দিরের কারুকার্য্য যেন বিশ্বকর্ম্মা স্বহস্তে করিয়াছেন। মানবের তুলিকাস্পর্শে এত মনোরম—এত রমণীয় চিত্র চিত্রিত হইতে পারে—এ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। মন্দিরের উপরিভাগ এমনই নিপুণ হস্তে খিলান যে, দেখিলে মনে হয় যেন শূন্য-মার্গে উহা আপনা হইতেই ঝুলিয়া রহিয়াছে। মন্দিরটী দেখিলে নয়নের অভাব বলিয়া মনে হয়; দুটী মাত্র চক্ষু দর্শনকার্য্য সম্পন্ন করিতে যেন ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

বাল্যকাল হইতেই অহল্যাবাইয়ের হৃদয়ে

প্রগাঢ় ধর্ম্মভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। গয়ার একটী দেবমন্দিরে এই ধর্ম্মপ্রাণা সাধ্বী সতীর একখানি পবিত্র চিত্র আছে। মন্দিরমধ্যে রাম সীতার যুগল মূর্ত্তি,—নিকটে ভক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি, শিবভক্তা অহল্যাবাই ভক্তিগদগদচিত্তে শিবপূজায় নিযুক্তা রহিয়াছেন।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মশীলা অহল্যাবাইয়ের পবিত্র আত্মা পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে প্রগাঢ় ধর্ম্মপ্রাণতার দ্বারা তিনি সমগ্র হিন্দুনারী-সমাজকে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরকাল যে ভারত ইতিহাসে প্রগাঢ় ভক্তিভরে কীর্ত্তিত হইবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাঁহার ত্রিশ বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে প্রতি বৎসর প্রচুর অর্থ ও খাদ্য দ্রব্যাদি প্রত্যেক দেবালয়ে দান করা হইত। দরিদ্রের জন্য তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদা কাঁদিত। তিনি শীতকালে দরিদ্রদিগকে বস্ত্র দান এবং গ্রীষ্মকালে পথিকদিগের নিমিত্ত স্থানে স্থানে অন্নসত্র ও জলসত্রের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পশু পক্ষীর প্রতিও তাঁহার দয়া সমভাবে ছিল। ক্ষেত্রে কৃষকেরা পাখী বসিতে দিত না,—তাই অহল্যাবাই কৃষকদিগের নিকট হইতে শস্যক্ষেত্র ক্রয় করিয়া পাখীদের নিমিত্ত ছাড়িয়া দিতেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা রাজসাহী।

আমি।

(১)

মাটীর পুতুল আমি
তোমার হাতেতে গড়া,
তোমারি খেলনা নাথ!
তোমারি বসন পরা।
সকলি তোমার দেওয়া—
প্রেমময়—দয়াময়!
আমারে ভাঙ্গিয়া দিও
যখনি বাসনা হয়।

(২)

আমি কে? তোমারি দাস,
তোমারি চরণধূলি,
তোমারি মুখেতে বলি
তোমারি শিখান বুলি;
তোমারি সকল প্রভো!
প্রেমময়! দয়াময়!
আমারে ভাঙ্গিয়া দিও
যখনি বাসনা হয়।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

জাপানের অভ্যুদয়।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

১৮৯৪-৯৫ সালের China-Japanese war-এর পর হইতে (the great expansion of national resources after the close of the C. J. war) শিল্প-

বিদ্যার মূল্য জনসাধারণ বুঝিতে লাগিল। সেই সময় হইতে technical স্কুল অতি শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। শিল্প-শিক্ষকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য স্কুল খোলা হইল। কৃষিবিদ্যালয় ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য স্কুল স্থাপন করা হইল। এক্ষণে জাপানে ২৭,১৫১টী Elementary School—এ ৫১৩৫৪৮৭ ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে। শিক্ষোপযোগী বালকদিগের মধ্যে শতকরা ৯১$\frac{১}{২}$ ছাত্র শিক্ষা লাভ করে। ৫৭টী Normal স্কুলে ১৯১৯৪ ছাত্র অধ্যয়ন করে। শিল্পশিক্ষার জন্য supplementary স্কুলসংখ্যা ৬৩০ এবং তথায় ৩১০১৩ ছাত্র অধ্যয়ন করে। Technical শিল্পবিদ্যালয় class এবং Apprentice স্কুলের সংখ্যা ৯৯, এবং সেখানে ৬৫১০ জন ছাত্র। ২৫৮টী Middle School—ছাত্রসংখ্যা ৯৫,০২৯। স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষার স্কুল ৮০, ছাত্রীসংখ্যা ২১৫২০। গভর্ণমেণ্ট Higher Normal School ৩টী—ছাত্র ১০০০। Industrial School ও Technical School of class A ১৩০, ছাত্র ২০৩৩। Imperial University ২টী—ছাত্রসংখ্যা ৪০৪৬। Private ও Public college সংখ্যা ৫০, ছাত্র ১৬৯৬০। Government Teacher's Training Institute ৮টী—ছাত্র ৩১৯। Blind ও Dumb School গবর্ণমেণ্ট ১টী ও ১৮টী private ও public. Library ৬৭। Private ও Public Miscellaneous School ১৬৫৭টী। রুষিয়ার সহিত যুদ্ধে যদিও এসিয়ার পূর্ব্বে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি জাপানের বিদ্যালোচনা স্থিরভাবে চলিতেছে; ইহাতে উৎসাহ কম হওয়া দূরে থাকুক, ছাত্র ও শিক্ষকগণ উৎসাহে ও পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিতেছেন। যদিও রাজ্যের অন্য বিভাগের খরচ পূর্ব্বাপেক্ষা সম্ভবমত কম করা হইয়াছে, কিন্তু শিক্ষাবিভাগের খরচে আদৌ হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, জাপানে শিক্ষাকে জাতীয় স্বাধীনতা ও উন্নতির প্রধান উপকরণ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। অতীব দুর্ব্বল বা রোগাক্রান্ত না হইলে কাহারো মূর্খ থাকিবার অধিকার নাই। আজি সেই শিক্ষার বলে সকলে এক উদ্দেশ্যে দেশের উন্নতিকল্পে ও দেশ-রক্ষার্থে স্বীয় জীবনকে অবলীলাক্রমে বিসর্জ্জন দিতেছে। ইহাদের যদি উন্নতি না হইবে ত হইবে কাহার? জাপানী স্ত্রীলোক-দিগের "শিক্ষা, পারিবারিক পরিচর্য্যা, সন্তানবাৎসল্য প্রভৃতি দর্শন করিলে মনে হয়, ভারতের মহিলাগণ কোনও গভীর অজ্ঞান-তিমিরে নিমগ্ন।" পুত্র কন্যাকে কিরূপে মানুষ করিতে হয়, উহা তাঁহারা জানেন।"

জাপানের জননীরা পুত্রকন্যাদিগকে কখনও তীব্র ভৎর্সনা বা তিরস্কার করেন না। কোনরূপ দোষ করিলে স্নেহ মমতার স্বরে ছেলেকে বুঝাইয়া দেন যে, তাহার ত্রুটি হইয়াছে। এই জন্যই জাপানে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদিগকে অতিশয় কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন দেখা যায়। চারি

বৎসরের শিশুর নিকট মাতারা যে সব বীরত্ব ও পুণ্যকাহিনী বিবৃত করেন, উহা তাহার ধমনী মজ্জাতে গ্রথিত হইয়া যায়। শিশুরা অতি শৈশবকাল হইতেই এক মহান্ লক্ষ্য লইয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। জাপানে ছেলেদের ক্রীড়া ব্যায়াম ও যুদ্ধ শিক্ষা, এবং মেয়েদের শিল্প-কার্য্য ও উদ্যানভ্রমণ। আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা অতি শৈশবকাল হইতে যেরূপ স্ত্রীপুরুষের ভেদাভেদ করে, সেখানে সেরূপ নয়। জাপানে ১৭।১৮ বৎসরের বালক ১৪।১৫ বৎসরের বালিকা স্ত্রী পুরুষে বিভিন্নতা কচিৎ উপলব্ধি করিয়া থাকে। উহারা পরস্পরের সহিত এমন পবিত্র ও স্বাধীনভাবে মিলিতে পারে যে ভারত-বাসীর পক্ষে ইহা অদ্ভুত দৃশ্য বলিয়া বোধ হইবে। জাপানের মেয়েরা ২০।২৫ বৎসর পর্য্যন্ত স্কুলে কিম্বা কোন শিল্পশিক্ষালয়ে অধ্যয়ন করেন, এবং যে পর্য্যন্ত কোন প্রকার ব্যবহারিক শিক্ষায় পারদর্শী না হন, সে পর্য্যন্ত আপনাদিগকে সাংসারিক জীবনের অযোগ্য মনে করেন, সে পর্য্যন্ত শিক্ষায় নিযুক্ত থাকেন। এই সব দেখিয়া মনে হয় যে, জাপানের প্রায় প্রত্যেক বয়স্থা কন্যা জানেন,—পরিজনের প্রতি, স্বদেশ ও স্বজাতীর প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি। সেই জন্যই জাপান এত উন্নত।

শ্রীকরালী চরণ হাজরা।

কবীর।

কবীর পান্থী নামক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। কবীর কাহার পুত্র অথবা কোন জাতীয়,তৎসম্বন্ধে একটু গোলযোগ আছে। মুসলমানেরা বলেন কবীর মুসলমান ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার জাতি কুল ও জন্ম বিষয়ে নানারূপ অলৌকিক বর্ণনা আছে। সেগুলি অবিশ্বাস্য বোধে এ স্থলে উদ্ধৃত হইল না। ভক্তিমাহাত্ম্য নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে—তিনি তন্তুবায়ের ঘরে জন্মিয়াছিলেন,সুতরাং তিনি জাতিতে তন্তুবায় ছিলেন। প্রথমে কবীর জাতীয় ব্যবসায়ানুসারে বস্ত্র-বয়ন করিতে শিখেন, তৎপরে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন,—এ সংসার অসার, এ জীবন পদ্মপত্রে জলের মত। কে আমার গুরু হইবে? কে আমাকে এ সংসার-সাগর হইতে পরিত্রাণ করিবে?

একদিন কবীর কতকগুলি সাধুর নিকট যাইয়া আপন মনোভাব জানাইলেন। সাধু বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুই? কি চাস্?" তিনি বলিলেন, "আমি জাতিতে তন্তুবায়, রামানন্দের শিষ্য হইতে ইচ্ছা করি।" বৈষ্ণবগণ উপহাস করিয়া কহিল, 'তুই ম্লেচ্ছ! তোর গুরু কে হইবে?' তখন কবীর নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মন নিতান্ত ব্যাকুল হওয়ায় তিনি পুনরায় সাধুগণের নিকট আসিয়া মনোবেদনা

জানাইলেন। এবারও তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইল। তিনি অস্থিরচিত্তে কাশীতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, যাহাকে দেখেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি বলিতে পার গুরু রামানন্দ কোথায়?" এইরূপে বহুদিন গত হইল। একদিন একজন বৈষ্ণব তাঁহাকে দয়া করিয়া বলিল,—"গুরু রামানন্দ অমুক স্থানে বাস করেন। তিনি প্রত্যহ রাত্রিশেষে বহির্দ্বার খুলিয়া গঙ্গাস্নানে বাহির হন। তুই রাত্রি থাকিতে তাঁহার বহির্দ্বারের সম্মুখে যাইয়া শুইয়া থাকিস্। যখন দ্বার খুলিয়া তিনি বাহিরে আসিবেন, তাঁহার পদ তোর অঙ্গে লাগিবে। তৎকালে তিনি যে নাম উচ্চারণ করিবেন, তাহাই তুই গুরুমন্ত্র ভাবিয়া গ্রহণ করিবি। ইহা ভিন্ন রামানন্দের শিষ্য হইবার অন্য কোন উপায় নাই।" কবির বৈষ্ণবের কথায় আশ্বস্ত হইলেন। শুভদিনে রাত্রিশেষে রামানন্দের দ্বারে আসিয়া শুইয়া রহিলেন। রাত্রিশেষে রামানন্দ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে কুশ তিল লইয়া স্নানার্থে যেমন বাহির হইবেন, অমনি কবীরের অঙ্গে তাঁহার পদস্পর্শ হইল; কবিরও মহাসমাদরে গুরুপদ ভাবিয়া চুম্বন করিলেন। রামানন্দ ম্লেচ্ছের গায়ে পা লাগিল দেখিয়া 'রাম! রাম! কে তুই?' এই কথা উচ্চারণ করিলেন। এইরূপে কবীরের মনোরথ পূর্ণ হইল। তিনি রামানন্দকে গুরু সম্বোধন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। সেই অবধি কবীর 'রাম নাম' সার করিলেন। তিনি স্তব স্তুতি কিছুই জানিতেন না, কেবল রামনামই মুক্তির সোপান ভাবিতেন। তদবধি তিলকমালা ধারণ করিয়া অপরাপর বৈষ্ণবের মত কাশীধামে বাস করিতে লাগিলেন। কবীরের আচার ব্যবহার দেখিয়া বৈষ্ণবেরা ক্রুদ্ধ হইল। একদিন তাহারা কবীরকে ডাকিয়া বলিল,—রে ম্লেচ্ছাধম! তুই কি সাহসে তিলকমালা ধারণ করিতেছিস্? কে তোরে এ দুর্ব্বুদ্ধি দিয়াছে। কবীর নিতান্ত শান্ত ভাবে উত্তর করিলেন, "সত্যই বলিতেছি, গুরু রামানন্দ আমাকে রামমন্ত্র দিয়াছেন, তাই আমি এমন হইয়াছি।"

সকলে আসিয়া রামানন্দকে কবীরের কথা বলিল। রামানন্দ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি গুরুর নিকট আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, প্রভো! আপনি কি ভুলিয়া গেলেন? সে দিন রাত্রিশেষে আমি আপনার দ্বারে শয়ন করিয়াছিলাম, আপনি আমার অঙ্গে পদ দিয়া রামনাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই দিন আমি রামমন্ত্র লাভ করিয়াছি। সেই দিন হইতে নিয়তই রামনাম জপ করিয়া থাকি। প্রভো! ইহাতে যদি আমার দোষ হইয়া থাকে, দয়া করিয়া ক্ষমা করুন। রামানন্দ কবীরের পরিচয় পাইয়া ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই দিন হইতে কবীরকে সকলে একজন ভক্ত বলিয়া জানিলেন।

কবীর যে কেবল ভক্ত ছিলেন, তাহা

নহে; অত্যন্ত দয়ালু বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। একদিন একখানি বস্ত্র লইয়া তিনি বিক্রয় করিতে যাইতেছেন, তখন শীতকাল; পথে জনৈক বৃদ্ধ শীতার্ত্ত হইয়া বস্ত্রখানি চাহিল, কবীর তখনই অম্লানবদনে তাহাকে বস্ত্রখানি দিলেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সংসারের কথা তাঁহার মনে উদয় হইল। আজ যে তাঁহার গৃহে অন্ন নাই, তাঁহার মাতা যে পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন। কবীর রিক্তহস্তে কেমন করিয়া গৃহে যাইবেন? তিনি মনে মনে ভাবিলেন, আজ দরিদ্রকে এই বস্ত্রখানি দিয়া আমার যে সুখ হইল, বস্ত্রখানি বেচিয়া অর্থ লইয়া এমন সুখ তো পাইতাম না। কবীর গৃহে আসিয়া শুনিলেন তাঁহার মাতা অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া তাঁহার জন্য বসিয়া আছেন। কবীর জননীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—"সে কি কবীর তুমিই যে লোক দিয়া আমাকে অর্থ পাঠাইয়া দিয়াছ।" তখন কবীর ভক্তি-গদ্গদ ভাবে মাতাকে কহিলেন,—"ভগবৎ কৃপাতেই এ সকল আমরা পাইয়াছি।" এই মত দৈব উপায়ে অর্থপ্রাপ্তি ও দান সম্বন্ধে কবীরের অনেক খ্যাতি ও অলৌকিক বর্ণনা আছে। সে সকল বিশ্বাসযোগ্য না হওয়ায় এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

কিছুদিন পরে কবীর নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া দিল্লীতে গমন করিলেন। তখন দিল্লীতে যবনরাজ শিকন্দর লোদী রাজত্ব করিতেছিলেন। দুষ্ট লোকেরা যবন-রাজকে জানাইল যে, কবীর নামে এক দুষ্ট জোলা আসিয়া অনেককে বঞ্চনা করিতেছে, এরূপ লোককে রাজার শাস্তি দেওয়া উচিত। সিকন্দর কবীরকে ধরিবার আদেশ করিলেন। কবীর ধৃত হইলেন, এবং শুনিলেন তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে। যবনরাজসমীপে কবীর আনীত হইলে রাজপুরুষগণ তাঁহাকে নমস্কার করিতে বলিল। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"কাহাকে আবার প্রণাম করিব? এ সংসারে কে বধ্য নয়?" তখন যবনরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে যমুনার অগাধ জলে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়া দিতে বলিলেন, রাজ-পুরুষেরা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে যমুনার অগাধ জলে ফেলিয়া দিল, কিন্তু তিনি কোনও উপায়ে তাহা হইতে রক্ষা পাইলেন। সেই কথা সকলে যবনরাজকে জানাইল। তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও যখন কবীরকে বধ করিতে পারিলেন না এবং সকলে কবীরের প্রশংসা করিতে লাগিল দেখিলেন, তখন সিকন্দরের মন টলিল। তিনি কবীরকে ডাকিয়া সাদরে কহিলেন, "সাধো আমার দোষ ক্ষমা করিও। তুমি মহাজন, আজ আমি বুঝিতে পারিলাম।" কবীরের সিকন্দর কর্ত্তৃক এই বধচেষ্টার সম্বন্ধেও অনেক অলৌকিক বর্ণনা আছে; সে সকল নিষ্প্রয়োজন বোধে এ স্থলে পরিত্যক্ত হইল।

তথা হইতে কবীর কাশীধামে আসিলেন। এখানে তিনি সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া আত্মজ্ঞানলাভে যত্নবান্ হইলেন। এই কাশীতেও চারি দিকে তাঁহার বিপক্ষ

ঘৃণিত, এবং সর্ব্বদা তাঁহাকে জব্দ করিতে চেষ্টা করিত; কিন্তু ভগবানের কৃপায় কেহই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিত না। যুগে যুগে সাধুগণের প্রতি অত্যাচারের পরিণাম যেরূপ হইয়া থাকে, তাহাই হইত। শেষে তাহারা আপনাদিগের কুকার্য্যের জন্য আপনারা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত। কাশীবাসি মাত্রেই কবীরের গুণের পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। এমন কি একটী বারবিলাসিনীও দূর হইতে তাঁহার কার্য্যকলাপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া উদ্ধার পাইয়াছিল।

তাঁহার মৃত্যু বিষয়ে এইরূপ জানা যায় যে, একদিন তিনি মণিকর্ণিকার পরপারে আসিয়া ঐ স্থানে নিদ্রাকর্ষণ হওয়ায় মৃত্তিকোপরি শয়ন করেন। বহুস থাক লোক তাহার সমভিব্যাহারে আসিয়াছিল। শিষ্যেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরীরে বস্ত্র আচ্ছাদন করে। তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হয় অর্থাৎ আর তিনি উঠেন নাই। কিন্তু শিষ্যেরা বস্ত্রমধ্যে আর তাঁহার মৃতদেহ পায় নাই। হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে তাঁহার দেহের সৎকার লইয়া অনেক বিবাদ হইয়াছিল, কিন্তু বস্ত্রমধ্যে তাঁহার মৃতদেহ প্রাপ্ত না হওয়ায় সে বিবাদের কোন মীমাংসা হয় নাই।"

(ভক্তমাল গ্রন্থ ১৮০-১৮৫ ১ পৃঃ)

বস্তুতঃ কবীর যে একজন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তিনি যে জাতীয়ই হউন, তাঁহার নিকট হিন্দু মুসলমান সকলেই সমান। তিনি অকুতোভয়ে শাস্ত্র ও কোরাণের প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন হিন্দুদিগের রাম এবং মুসলমানের করীম স্বতন্ত্র নয়, অনুসন্ধান কর হৃদয়ে দেখিতে পাইবে। এই বিশ্ব যাঁহার সংসার, আলি ও রামেয়া যাঁহার সন্তান, তিনিই আমার পীর। তিনি জপ পূজা স্বীকার করিতেন না। এ সম্বন্ধে তিনি বলিতেন—

"মনকা ফেরত জনম্ গয়ো গয়ো না ও
মনকা ফেরু।
কর্‌কা মন্‌কা ছোড় কর্ মন্‌কা ফের॥"

জপ-মালার গুটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে জীবন গেল, কিন্তু মনের ঘোর কাটিল না; তাই বলি,—হাতের গুটি ছেড়ে মনের গুটি ঘুরাও।

তিনি জাতিভেদও স্বীকার করিতেন না। তাঁহার বচনে পাওয়া যায়—

সব্‌গে হিলিয়ে সব্‌গে মিলিয়ে সব্‌কা লিজিয়ে
নাঁও।
হাঁজী হাঁজী সব্‌গে কিজিয়ে বসে আপন
গাঁও॥

সকলের সঙ্গী হইবে, সকলের সহিত মিলিবে, সকলের নাম গ্রহণ করিবে, হাঁজী হাঁজী সকলেই বলিবে, কিন্তু আপন জায়গায় থাকিবে।

তিনি সংসারকাণ্ড দেখিয়া দুঃখ করিয়া বলিতেন—

"বামহন্ টামন মুরখ ভয়ে শূদ্র পড়ে গীতা।
ঠগ্ ঠগর বন্দ আচ্ছা থাবে দুঃখ পাবে
পণ্ডিতা॥

আকাকো মারে লাঠা ঝুটা জগৎ পিতায়।
গোরস্ গলি গলি ফেরে সুরা বৈঠ
বিকায়॥
সতীকো না মেলে ধোতি গস্তান্ পহরে
খাসা।
কহে কবীরা দেখ ভাই দুনিয়াকো
তামাসা॥"

কবীরের জাতিকুল লইয়া যেমন গোল, কবীরপন্থীরা তাঁহার সময় লইয়াও সেইরূপ গোল করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, ১২০৫ সম্বতে কবীর টক্‌সার শাস্ত্র প্রকাশ করেন, এবং ১৫০৫ সম্বতে মগর নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহা হইলে প্রায় ৩০০ শত বর্ষ কবীরের পরমায়ু হইয়া পড়ে। ইহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, তিনি যে সিকন্দর লোদীর সমসাময়িক, তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। সিকন্দর ১৫৪৪ সম্বতে রাজ্য পান; অতএব এই সময়ে যে কবীর বিদ্যমান ছিলেন, তাহাই সম্ভব বলিয়া স্বীকার করা যায়। শিখদিগের ধর্ম্মগুরু নানকও কবীরের মত আপন ধর্ম্মগ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন সৎনামী, সাধু, শ্রীনারায়ণী ও শূন্যবাদীদিগের গ্রন্থেও কবীরের বচন পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয়, উক্ত সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকগণও কবীরের মত লইয়া সেই সঙ্গে স্ব স্ব মত প্রচার করেন।

কবীরপন্থীরা সকল দেবতা অপেক্ষা বিষ্ণুর প্রতি অধিকতর ভক্তিমান্। রামানন্দী ও অপর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত ইঁহাদের বেশ সদ্ভাব ও আচার ব্যবহার প্রায় একরূপ, তাই অনেকে কবীরপন্থীদিগকে বৈষ্ণব বলে। ইঁহারা বৈষ্ণবের ন্যায় বেশভূষা করেন, এবং হাতেও তুলসীর মালা ধারণ করেন। কিন্তু কবীরপন্থীরা জানেন এ সবই বৃথা আড়ম্বর মাত্র। বাস্তবিক ইঁহারা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত কোন দেবদেবীর উপাসনা ও হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াদির অনুষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করেন না। কবীরপন্থীদিগের মধ্যে সাধারণতঃ দুই দল,—গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী; গৃহস্থেরা স্ব স্ব জাতিগত আচারাদি অবলম্বন করেন। কেহ আবার স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দুর দেবদেবীরও পূজা করেন। সন্ন্যাসীরা নয়নের অগোচর কেবল কবীরেরই ভজনা করেন। তাঁহাদের গুরুমন্ত্র গ্রহণ করিতে হয় না। তাঁহারা কেবল ধর্ম্ম গান করাকেই উপাসনা মনে করেন। সকলেই ইচ্ছানুরূপ বেশ ভূষা করেন। কেহ কেহ উলঙ্গ হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান। ইহাদের মহন্তেরা মাথায় টুপী পরেন। উক্ত দুই দল প্রধানতঃ ১২ শাখায় বিভক্ত। ঐ ১২ শাখা ব্যতীত আরও কতকগুলি শাখা আছে। ইঁহারা অপর স্থানাপেক্ষা বারাণসীর কবীরচৌর নামক স্থানকেই প্রধান তীর্থ বলিয়া বিশ্বাস করিবেন। কবীরপন্থীদিগের প্রকৃত ধর্ম্মমত জানা যায় না, তবে হিন্দুধর্ম্ম হইতেই যে উক্ত ধর্ম্মের উৎপত্তি তাহার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁহাদের মতে কবীরধর্ম্মই সত্য, অপর সকল ধর্ম্মই মিথ্যা। সংসারত্যাগ ও

গুরুভক্তিই ইঁহাদের মতে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। দোষ করিলে গুরু তাঁহাকে ভৎসনা করিতে পারেন, কিন্তু তিনি দণ্ড দিতে পারেন না।

ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে ও মধ্যভারতে অনেক কবীরপন্থী বাস করেন। ইঁহারা বড় সত্যপ্রিয়, উপদ্রবশূন্য ও নিতান্ত ভাল মানুষ। ইঁহাদের উদাসীনেরা অপরাপর সন্ন্যাসীর মত দুরন্ত-স্বভাব নহেন এবং ভিক্ষা করিয়া বেড়ান না। কাশীধামে কবীরচৌর নামক স্থানে অনেক কবীর-পন্থী আসিয়া বাস করেন। পূর্ব্বে কাশীরাজ বলবন্ত সিংহ তথাকার কবীরপন্থীদিগের আহারাদির জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। তৎপুত্র চেৎসিংহ কবীর পন্থীদিগের সংখ্যা নিরূপণ করিবার উদ্দেশে কাশীর নিকট এক মেলা করেন, তাহাতে প্রায় ৩৫ ০০০ কবীরপন্থী সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়াছিল।

শ্রীসরোজিনী দেবী।

নারীর গৃহধর্ম্ম।

মানবশিশু নারীজাতির কোমল হস্ত-গঠিত। পুণ্য-জ্যোতি বিভাসিত গার্হস্থ্য জীবনকে নিয়ত উন্নতির পথে পরিচালনার ভার সম্পূর্ণ নারীজাতির হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। দেশ বিদেশের সহস্র মহৎ লোকের পুণ্যময় জীবনী ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সভ্যতার প্রাদুর্ভাবের সহিত বঙ্গগৃহে বিষম পরিবর্ত্তনের বন্যা অশাসিত ও উচ্ছৃঙ্খলভাবে প্রবাহিত হইতেছে। ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস ও পবিত্র জীবনাদর্শ গৃহে অক্ষুণ্ণ রাখিতে না পারিলে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা একান্তই আশঙ্কাজনক ও ভারতনারীর অগৌরবের কারণ। আমি সম্প্রদায় বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলিতেছি অনুগ্রহপূর্ব্বক কেহই যেন ইহা মনে না করেন। নিষ্ঠা, সংযম, ভগবানের করুণায় প্রগাঢ় বিশ্বাস, সাধুতা কোন সম্প্রদায়েরই পরিত্যাজ্য হইতে পারে না। গৃহই পুরুষগণের সর্ব্ব-বিধ সুখ শান্তি ও আরামস্থল। এই রাজ্যটীতে স্নিগ্ধ শান্তি, শুদ্ধতার বিমল স্রোত প্রবাহিত করার সম্পূর্ণ ভার নারী-জাতির হস্তে। আমরা সেই পরম নিষ্ঠাবতী প্রাতঃস্মরণীয়া ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসিমার পবিত্র স্মৃতি অতীব শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করিয়া কৃতার্থ ও উপকৃত হই। তাঁহারা সংসারের মহাপ্রতিকূল অবস্থায় ঘোর রোগ শোকের তুফানে, যে প্রকার বীর নারীর ন্যায় সংগ্রাম করিয়া ছিন্ন ভিন্ন সংসারকে ধর্ম্মের বলে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, আজ ত তাহা স্মরণ করিয়া কত উপকৃত হইতেছি। সংসারের অগণিত কঠোর ও জটিল কর্ত্তব্য সংসাধনে তাঁহারা জীব-নের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হৃদয় ও মনের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করিতে কদাচ বিন্দু পরিমাণে ইতস্তত করেন নাই। এত

কর্ম্মকোলাহলে ডুবিয়াও স্বধর্ম্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠাপূর্ণ অনুষ্ঠান ভুলিয়া জলস্পর্শ করিতেন না। আমাদের কোমল শৈশব হৃদয়ে উপকথা রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী বলিয়া যে ভাব উদ্রেক করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা ভুলিতে পারি না। ঘোর-শ্রমে ক্লান্ত হইয়া যখনই তাঁহারা গভীর নিশীথকালে বিরামদায়িনী নিদ্রার কোল আশ্রয় লইতে গমন করিতেন, আমরা এতগুলি আবদারে সন্তান অল্প বলিবার জন্য তাঁহাদিগকে উত্যক্ত করিতে সঙ্কুচিত হইতাম না। দৈনিক জীবনে তাঁহাদের ধর্ম্ম-প্রবণ হৃদয়ের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া সকলেই অসীম শ্রদ্ধা বিশ্বাস ও সম্ভ্রম সহকারে তাঁহাদিগকে পূজা করিত। এই উচ্চ স্থানই নারীর আরাধ্য বলিয়া আমার বিশ্বাস।

এই বর্ত্তমান সময়ে সভ্যতা ও পাশ্চাত্য ভাবের অনিবার্য্য প্রবাহে ভারতের গৃহে গৃহে উচ্ছৃঙ্খলতা, ধর্ম্মবিহীনতা ও অসত্য দোষ প্রবেশ করিয়া মিতাচারপূর্ণ বাঙ্গালীর গৃহ ঘোরতর অশান্তিপূর্ণ করিয়াছে। এখনকার মা, ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসীমা ও মামীগণ অনেকেই আমার ঠাকুরমাদের অপেক্ষা অধিকতর সভ্য ও শিক্ষিত। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়জন গৃহের মধ্যে সন্তানাদির হৃদয়ে ধর্ম্মের প্রভা বিস্তার জন্য প্রয়াস পাইয়া থাকেন। আশা করি, এই ধৃষ্টতা মার্জ্জনাপূর্ব্বক আধুনিক মহিলাগণ ভবিষ্যৎবংশীয়দের অগঠিত হৃদয়ে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিতে সতত ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা সহকারে যত্নবতী হইবেন।

স্বর্ণপ্রভা বসু।

দৃষ্টান্তে উপদেশ।

খৃষ্টধর্ম্ম-গুরু যিশুখৃষ্ট অনেক সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা মহা মহা উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটী উদাহরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

১। তিনি এক সময় বলিলেন, কোনও কৃষক ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে গেলেন। তিনি যখন বপন করিলেন, তখন কতক বীজ রাস্তার ধারে আসিয়া পড়িল, তাহা পক্ষীরা ভক্ষণ করিল; কতক বীজ ভূমিতে পড়িল, সেখানে অল্প মাটি থাকায় অঙ্কুর শীঘ্র উৎপন্ন হইল, কিন্তু যখন সূর্য্যোদয় হইল, তখন সে সকল জ্বলিয়া গেল; কারণ তাহাদের শিকড় জন্মে নাই, সুতরাং অঙ্কুর শুকাইয়া গেল। কতকগুলি বীজ কণ্টক বনে পড়িল এবং কণ্টক গাছ বাড়িয়া তাহাদিগকে চাপিয়া মারিয়া ফেলিল। কিন্তু কতকগুলি বীজ উত্তম ভূমিতে পড়ায় তাহা হইতে বৃক্ষ সকল জন্মিয়া ফল উৎপাদন করিল। কোন বৃক্ষে শত গুণ, কোন বৃক্ষে ষাটিগুণ, কোন বৃক্ষে ত্রিশগুণ ফল ফলিল। তিনি শিষ্যদিগকে গোপনে ডাকিয়া ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করিলেন। সে অর্থ এই—স্বর্গরাজ্যের কথা যখন কোনও ব্যক্তি শোনে এবং বোধগম্য না করে, তখন

তাহার অন্তঃকরণে উপ্ত বীজ সয়তান আসিয়া কাড়িয়া লইয়া যায়। রাস্তার ধারে পতিত যে বীজের কথা বলা হইয়াছে, তাহা এইরূপ। প্রস্তরময় ভূমিতে যে ব্যক্তি বীজ পাইল, সে উপদেশবাক্য শুনিল এবং তৎক্ষণাৎ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিল, কিন্তু তাহার হৃদয়ে ইহা প্রবেশ করিল না। এই জন্য ধর্ম্মের জন্য যখন তাড়না বা উৎপীড়ন উপস্থিত হইল, তখন সে ধর্ম্মে স্থির থাকিতে পারিল না, বিরক্ত হইয়া তাহা ছাড়িয়া দিল। যে ব্যক্তি কণ্টকের মধ্যে বীজ পাইল, সে উপদেশ শুনিল; কিন্তু সংসারের ভাবনা চিন্তা এবং অর্থের মায়াতে, ধর্ম্মের অঙ্কুর বাড়িল না এবং তাহা হইতে কোনও ফল উৎপন্ন হইল না। কিন্তু উত্তম ভূমিতে বীজ কে পাইল? যে ব্যক্তি ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল, তাহারই হৃদয়ে ইহার ফল ফলিল,—কোথাও শতগুণ, কোথাও ষাটিগুণ, কোথাও ত্রিশ গুণ ফলিল।

ম্যাথিউ—১৩ অ। ২৫ পৃ।

(ক্রমশঃ)

স্ত্রী-চরিত্রের প্রভাব।

আমরা দেখি এ জগতে সকলেই এক উদ্দেশ্যে ধাবমান। সেটী কি? সুখ। সুখের জন্য আমরা কি না করিতেছি? কিসে সকলের অপেক্ষা অধিক ধন ও মান লাভ করিব, সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থানের অধিকারী হইব, এই সকল প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব লইয়া আমরা প্রতি নিয়ত ঘূর্ণায়মান। ধন, মান ও সুখের লালসায় আমরা কতশত অন্যায় কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু তাহাতেও সুখ লাভ হয় না; কারণ প্রকৃত সুখ একমাত্র সচ্চরিত্রতায়। আমরা সকলেই সুখের জন্য লালায়িত সত্য; কিন্তু এক একটী করিয়া চরিত্রের দোষ ও ত্রুটিসকল খণ্ডন পূর্ব্বক প্রকৃত চরিত্র লাভে সচেষ্ট নই। পরম পিতা পরমেশ্বরের রাজ্যে আমরা সকলেই সমানরূপ সম্পত্তি লাভপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ইচ্ছা করিলে প্রত্যেকেই আপন আপন বৃত্তিগুলিকে সতত ন্যায় পথে পরিচালনা করিয়া আদর্শ চরিত্র লাভ পূর্ব্বক প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে পারে। সচ্চরিত্রতার মহিমা অপার। ইহা ইহকালে মানবকে দেবত্বে পরিণত করে এবং পরকালেও অনন্ত সুখের অধিকারী করে। জগতে এমন কিছু নাই, যাহার সহিত এই দুর্ল্লভ রত্ন উপমিত হইতে পারে। পশুতুল্য ব্যক্তিও এই মহারত্নের নিকট মস্তক অবনত না করিয়া থাকিতে পারে না। এ সংসারে সকলে সমান জ্ঞানী বা ধনী হয় না, কিন্তু চরিত্র উৎকৃষ্ট হইলে জীবনের সুখ ও সৌন্দর্য্য বহুদূর প্রসারিত হয় সন্দেহ নাই। ইহার নিকট ধন, মান, জ্ঞান, উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, হৃদয়গ্রাহিণী বাগ্মিতা, বিনীত ব্যবহার যাহাই হউক না কেন কিছুই সমকক্ষতা

লাভ করিতে পারে না। চরিত্র প্রভাবে একদিকে যেমন লোক মণ্ডলীর শ্রদ্ধা, প্রেম ও ভালবাসা লাভ অনিবার্য্য, অপর দিকে তদ্রূপ বিদ্বেষ, ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। চরিত্রবিহীনতায় মানুষকে এরূপ ঘৃণিত করে যে তাহার নাম মাত্র শ্রবণে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। হাজার যত্ন চেষ্টা সত্ত্বেও হৃদয়ের এ স্বাভাবিক ভাব দূর করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ চরিত্র সুগঠিত হইলে এ জগতে ভীষণ প্রতিযোগিতা এবং ঈর্ষ্যার মধ্যেও আবাল বৃদ্ধ বনিতার শ্রদ্ধা ও প্রেমের পাত্র হইয়া আদর্শ জীবন লাভ করা যায়।

ব্যক্তিনিষ্ঠ সচ্চরিত্রতা প্রত্যেক জাতি ও সমাজের আশা ভরসা। যে দেশবাসী যে পরিমাণে চরিত্রবান্, সেই দেশ সেই পরিমাণে উন্নত হইয়া থাকে।

সমস্ত জাতির সমাজে সর্ব্বপ্রথম স্ত্রীচরিত্র কার্য্য করে। স্ত্রীলোক গৃহরাজ্যের রাণী। সুতরাং গৃহরাজ্যের সুখ শান্তি ও সুনিয়মের মূলে স্ত্রীচরিত্র কার্য্য করে। পারিবারিক শৃঙ্খলা ও নানা আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়া সন্তানচরিত্র গঠিত হয়। সন্তানগণের চরিত্র এবং জীবনের উপরেই সামাজিক ও জাতীয় উন্নতি বা অবনতি দণ্ডায়মান। সন্তানচরিত্রই দেশীয় উন্নতির ভিত্তিভূমি।

রমণীহৃদয় স্বভাবতঃ সুকোমল ও প্রেমপরিপ্লুত। কিন্তু কেবল কোমলতাগুণে সংসারে শান্তি সংস্থাপন বা মহত্তর উদ্দেশ্য সংসাধন অসম্ভব। প্রলোভনের আক্রমণ নিবারণার্থ নারীহৃদয় বজ্রবৎ সুকঠিন আবরণে আবৃত রাখা আবশ্যক। যেহেতু রমণীগণ যদি হৃদয় হইতে বিকৃত সৌন্দর্য্যস্পৃহা সংযত করিয়া, সত্য, ন্যায় ও প্রেমের সুকোমল শাসন শক্তি বিস্তারে যত্নবতী হন, তবে পরিবার ও প্রতিবেশিমণ্ডলে সদ্ভাব ও সুখলাভ সহজ হইয়া উঠে। শালীনতা স্ত্রীচরিত্রের ভূষণ। সাধুভাব ও বিনয় প্রভাবে জগতে স্ত্রীজাতি অনেক কার্য্য সাধন করিতে পারেন। কারণ, পবিত্র চরিত্রের নিকট জগৎ পরাজিত। অহঙ্কার দ্বারা অনেক সময় আমরা কর্ত্তব্যপথভ্রষ্ট হই এবং আমাদের আত্মা ক্রমশঃ অধোগামী হইতে থাকে। বৃথা সময় ক্ষেপণ করিলে চরিত্রের মূল্য হ্রাস হইয়া যায় এবং প্রগল্‌ভতা, মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও নানা দোষে চরিত্র ক্রমে ক্রমে কলঙ্কিত হইতে থাকে। পুষ্প যেমন সৌরভরাশি বিস্তার পূর্ব্বক মানুষের মন মুগ্ধ করে, চরিত্র ও তদ্রূপ নানা সদ্গুণে বিভূষিত হইয়া জীবনের সৌন্দর্য্য ও মূল্য বৃদ্ধি করে। চরিত্ররূপ চারা গাছ সদ্ভাবরাশি দ্বারা এ ভাবে বেষ্টন করিতে হইবে, যেন কেহ পদদ্বারা নষ্ট করিতে না পারে, অথবা অঙ্কুর ছাগল প্রভৃতিতে বিনষ্ট করিয়া না ফেলে। কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিয়া গেলে, সদ্ব্যবহার স্বতঃ প্রবাহিত হয়। যাহার হৃদয় পবিত্র তাহার বাক্য কখন নীচ হইতে পারে না। যিনি যথার্থ বিনয়ী এবং যাঁহার স্বভাব প্রেমপূর্ণ, তাঁহার ব্যবহার বা বাক্য কখন কর্কশ হইতে

পারে না। অথচ তাঁহার ব্যবহারে বা থাকে তোষামোদের লেশমাত্র থাকে না।

আমরা চরিত্র সুসংগঠন অপেক্ষা অর্থোপার্জ্জনকে বিদ্যাভ্যাসের মূল কারণ বলিয়া মনে করি; কিন্তু প্রকৃত চরিত্র লাভ না করিয়া বহু অর্থোপার্জ্জন সত্ত্বেও মানব কখনই যথার্থ সুখী হইতে পারে না।

অনেক স্ত্রীলোক বিশ্বকর্ত্তার বিধানে সন্তুষ্ট না হইয়া স্ত্রীজীবনকে অধিকতর দুঃখজনক মনে করেন। মঙ্গলময় মহাপ্রভুর আদেশ পালনের পরিবর্ত্তে কর্ত্তব্যে অমনোযোগী হইয়া অসন্তুষ্ট ও অলসভাবে জীবনকে দুঃখময় করেন। ইহা অপেক্ষা ভ্রম আর কি আছে? স্ত্রীজাতি তাঁহার চরিত্রপ্রভাবে জগতে কিনা করিতে পারেন? তাঁহাদের সংশিক্ষা ও সদ্ব্যবহারই সন্তান চরিত্রের ভিত্তিভূমি। এক একটী সন্তান সংসারে কি মহৎ কার্য্য না সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। কত অসদাচারী, বিপথগামী, দুর্দ্দান্ত পতি, পত্নীর পবিত্র প্রেমে পরাজিত হইয়া সৎপথাবলম্বী হইয়াছেন, কে তাহার সংখ্যা করে? বিবেকের প্রবর্ত্তনানুসারে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক ফলাফলের জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করিলে, এই সংসারেই স্বর্গ-সুখ মিলে। ফলতঃ চরিত্র জীবন নৌকার মাস্তুল বিশেষ। চরিত্র বিশুদ্ধ হইলে ধর্ম্মভাব স্বতঃ সন্দীপিত হয়। স্বর্ণাভরণের উপরে চাকচিক্য, গোলাপের মধ্যে সুগন্ধ এবং সুশোভন দৃশ্যের উপর সূর্য্যকিরণ যেরূপ মনোমুগ্ধকর, চরিত্রের মধ্যে ধর্ম্মভাব সেইপ্রকার উজ্জ্বল ও হৃদয়রঞ্জক। চরিত্রের সহিত ধর্ম্মের সম্মিলন মণি-কাঞ্চন-যোগের ন্যায় পরম রমণীয়। আত্মজ্ঞান লাভ জীবনের একটী বিশেষ কার্য্য। ধর্ম্মকার্য্যও গৃহকার্য্যের মধ্যেই গণনীয় বটে; কিন্তু সাংসারিক বাহ্যকার্য্যের অতীত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভও জীবনের একটী কর্ত্তব্য। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বিদ্যা, সময় ও শক্তির প্রয়োজন। আমরা সাংসারিক কার্য্যে এত মুগ্ধ ও ব্যস্ত যে, মুক্তি-সাধনরূপ মহৎকার্য্য বিস্মৃত হইয়া থাকি। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা এ বিষয়ে অধিকতর উদাসীন। শারীরিক ও মানসিক প্রভেদ বশতঃ স্ত্রী পুরুষের কার্য্যক্ষেত্র বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে, কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে তাহারা সমান। উভয়ের মধ্যে পরমাত্মা সমভাবে বর্ত্তমান, সুতরাং তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভে উভয়েরই সমান যত্ন থাকা আবশ্যক।

আত্মা অবিনশ্বর এবং ইহার অলঙ্কারও তদনুরূপ হইবে। স্বর্ণ, রৌপ্য, অথবা হীরকের জ্যোতিতে কি হৃদয় জ্যোতিষ্মান্ হইতে পারে? মুক্তা-জ্যোতিতে কি বিবেকবুদ্ধি জ্যোতিষ্মতী হয়? জাঁকজমকপূর্ণ পরিচ্ছদে কি চরিত্রের শোভা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়? আত্মার যথার্থ অলঙ্কার সত্য, পবিত্রতা, জ্ঞান, বিশ্বাস, আশা, প্রেম, আনন্দ ও নম্রতা। পরিণামদর্শিতা, তিতিক্ষা, শিষ্টতা এই সকল হৃদয়ের অলঙ্কার। এই সকল গুণ দ্বারা মানুষের অন্তর শোভিত হয়।

ঈশ্বরে ভক্তি চরিত্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুকুট

ইহার অভাবে কোন গুণই বাঞ্ছনীয় বা মনোহারী হইতে পারে না। ধর্ম্মনিষ্ঠাদ্বারা মানুষ অপরের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত থাকে। অপরকে সৎশিক্ষা দানে যত্ন করে। দিবানিশি সাধুকাজে ব্যস্ত থাকিতে ভাল বাসে, আত্মার অবিনশ্বরত্বের আশায় তাহার জীবনের দিন সকল উজ্জ্বলতর হয় এবং ইহজীবনের কার্য্য শেষ হইলে প্রফুল্লহৃদয়ে পরজীবনে গমন করিতে পারে।

শ্রীবিনোদিনী সেন।

সাঙ্কেতিক ভাষা।

আজ বামবোধিনীর পাঠকপাঠিকাদিগের নিকট একটী সাঙ্কেতিক ভাষা উপস্থিত করিলাম। ইহা অতিশয় আমোদজনক; এবং শিক্ষা করাও সহজ। যাঁহারা ইহা শিক্ষা করিবেন, তাঁহারা সহস্র লোকের মধ্যে থাকিয়াও কথাবার্ত্তা করিতে পারিবেন; অথচ অন্য কেহ বুঝিতে পারিবে না। ইহা দ্বারা মুখে কোন বাক্য উচ্চারণ করিতে হয় না; কেবল ইঙ্গিতে কার্য্য হয়। ইহাতে দিবাভাগে অথবা রাত্রিকালে আলোক সমক্ষে কথাবার্ত্তা চলিবে। অন্ধকারের জন্য পৃথক্ সঙ্কেত আছে; তাহা বারান্তরে প্রকাশ করা যাইবে।

শিক্ষাপ্রণালী—

শিক্ষার্থিগণ নিম্নলিখিত পদ্যটী মনে রাখিবেন।

"অহিকুম্ভ চক্রসহ ধরহ টঙ্কার।
তরবারি পাখা যাঁতা ক্রমবর্গ সার॥
বর্ণ মতে সংখ্যা ধরি অঙ্গুলি তুলিবে।
যুক্তবর্ণকালে তাহা কুঞ্চিত করিবে॥"

এক্ষণে ইহার অর্থ লেখা যাইতেছে।

অহি = সর্প।

কুম্ভ = মাটির ছোট ভাঁড়।

চক্র = গোলাকার অস্ত্র বিশেষ। বা কুম্ভকারের চাক।

টঙ্কার = ধনু।

তরবারি = অস্ত্র।

পাখা = যাহাতে বাতাস করা যায়।

যাঁতা = যাহাতে ডাল কলাই ভাঙ্গা হয়।

ক্রমবর্গসার = বর্ণক্রমে অহিকুম্ভাদি ব্যবহার করিতে হইবে।

যথা—

অহি অর্থে স্বরবর্ণ বুঝায় ও অনুস্বার বুঝায়;
কুম্ভ অর্থে কবর্গের সমস্ত বর্ণ বুঝায়;
চক্র অর্থে চবর্গের সমস্ত বর্ণ বুঝায়;
টঙ্কার অর্থে টবর্গের সমস্ত বর্ণ বুঝায়;
তরবারি অর্থে তবর্গের সমস্ত বর্ণ বুঝায়;
পাখা অর্থে পবর্গের সমস্ত বর্ণ বুঝায়;
যাঁতা অর্থে য র ল ব শ ষ স হ বুঝায়।

মনে করুন,—"আমি ভাল আছি" এইটী ইঙ্গিতে বলিতে ইচ্ছা করি।

"আমি"—

"আ" অহি মধ্যে পড়িয়াছে। সুতরাং দক্ষিণ হস্তকে সর্পের চক্রের আকার

করিতে হইবে; তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে স্বরবর্ণ বলা হইতেছে। তারপর দুইটী অঙ্গুলি দেখাইতে হইবে, তাহা দ্বারা বুঝা যাইবে যে স্বরবর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ বলা হইতেছে; সুতরাং "আ" পাওয়া গেল।

"ম"—

"ম" পবর্গের পঞ্চম বর্ণ। সেই জন্য হস্ত দ্বারা পাখায় বাতাস করার ভাব করিতে হইবে, তাহা দ্বারা বুঝা গেল যে পবর্গের কোন বর্ণের কথা বলা হইতেছে, তারপর পাঁচটী অঙ্গুলি দেখাইলেই বুঝা গেল যে পবর্গের পঞ্চম বর্ণ বুঝাইতেছে। এই আমরা ম পাইলাম বাকি "ি"। ই স্বরবর্ণ মধ্যে; সুতরাং হস্তকে সর্পাকার করিতে ও ইহা স্বরবর্ণের তৃতীয় বর্ণ বলিয়া তিনটী অঙ্গুলি তুলিতে হইবে। ই পাওয়া গেল। এই "ই" যে "ম" র সহিত যোগ হইবে ইহা জানাইবার জন্য একটী অঙ্গুলির অগ্রভাগ বক্র করিতে হইবে। তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে এই "ই" "ম"র সহিত যোগ হইল।

"ভাল আছি"—

এইরূপে ভ পবর্গের মধ্যে সুতরাং হস্ত দ্বারা বাতাস করার ন্যায় করিতে হইবে, এবং ভ চতুর্থ বলিয়া চারিটী অঙ্গুলি দেখাইতে হইবে। এই ভ পাওয়া গেল। তারপর হস্তকে সর্পাকার করিতে হইবে এবং দুইটী অঙ্গুলি তুলিতে হইবে। তাহা হইলে "আ"কার পাওয়া গেল। এই আ যে "ভ"র সহিত যোগ হইবে ইহা দেখাইবার জন্য আকার দেখাইয়াই একটী অঙ্গুলির অগ্রভাগ কুঞ্চিত করিবে। যে কোন বর্ণ পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত করিতে হইবে, সেই বর্ণ বলিয়া অঙ্গুলি কুঞ্চিত করিবে।

এইরূপে সমস্ত বর্ণমালা বলিতে পারা যায়। কবর্গের বর্ণ হইলে হস্তকে কুম্ভের মত আকার করিবে।

চবর্গের বর্ণ হইলে একটী অঙ্গুলি কুম্ভকারের চাকা ঘুরাইবার মত করিবে। পরে বর্ণসংখ্যা অনুসারে অঙ্গুলি তুলিবে।

টবর্গের বর্ণ হইলে ধনু হইতে শর নিক্ষেপের সময় হস্ত যেরূপ করা হয়, সেইরূপ করিবে। এবং বর্ণসংখ্যা অনুসারে অঙ্গুলি দেখাইবে।

ত বর্গের বর্ণ হইলে—কোন দ্রব্য কাটিবার সময় অস্ত্র যেরূপ ভাবে ধরা হয়, হস্তকে সেইরূপ ভাবে রাখিবে, এবং বর্ণসংখ্যা অনুসারে অঙ্গুলি তুলিবে।

পবর্গের বর্ণ হইলে পাখার দ্বারা যেরূপে বায়ু সঞ্চালন করা হয়, হস্ত দ্বারা সেইরূপ ভাব করিবে, এবং বর্ণসংখ্যা অনুসারে অঙ্গুলি তুলিতে হইবে।

যখন "য" অন্তস্থ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত কোন বর্ণ বুঝাইতে হইবে তখন বাম হস্ত চিৎ করিয়া রাখিয়া তাহার উপর দক্ষিণ হস্ত উপুড় করিয়া রাখিবে। অর্থাৎ ইহা দ্বারা যুক্তা বুঝাইল। তাহার পর বর্ণসংখ্যা অনুসারে অঙ্গুলি তুলিবে।

এ কথাটী যেন মনে থাকে যে যুক্তবর্ণের সময় অন্য নিয়ম। মনে করুন —"ম" এর সহিত ব যোগ করিতে ইচ্ছা করি "ম্ব" তখন ম বলিয়া তাহার পর "ব"র

সঙ্কেত করিয়াই একটী অঙ্গুলী বক্র করিবে। তাহা হইলেই বুঝা গেল যে ব" ম"র সহিত যুক্ত হইল।

এই সঙ্কেত দ্বারা দিবাভাগে ও রাত্রি-কালে আলোকে কথা কহা চলিবে। অন্ধকারে কথা কহিবার পৃথক্ নিয়ম, সেও সহজ। আগামী বারে উহা প্রকাশ করা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকরালীচরণ হাজরা।

গৌরী।

রামপ্রসাদের কবিত্ব অসাধারণ, কল্পনা অতুলনীয়। একটী উপায়ে বিশ্বমোহিনী বিশ্বমাতার কোটিচন্দ্রনিভাননের ঐশ্বর্য্য-রাশি বুঝাইলেন, কন্যার আবদারা মিটাইলেন, আর স্বামীর দ্বারা সহধর্ম্মিণীর বিব্রতি ঘুচাইলেন।

বয়োবৃদ্ধি সহকারে কন্যার বিবাহ-চিন্তা পিতার মনে সমুদিত হইল, তিনি গৌরীকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। দেবগণের নিদেশানুসারে মহর্ষি নারদ শিববিবাহের ঘটকতা করিবার জন্য গিরিপুরে উপস্থিত হইয়া গিরিরাজের নিকট তাঁহার কন্যা গৌরীর বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন এবং দেবাদিদেব মহাদেব পাত্র—এ কথাও তুলিলেন। গিরিপতি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিলেন। পার্ব্বতীও বাল্যাবধি মহাদেবকে স্বামিত্বে বরণ করিবার কামনায় পঞ্চতপাদি কঠোর তপশ্চারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কবির বর্ণনায় তাহা পাঠ করুন :—

সুকুমারী সুশোভনা, শশিমুখী ত্রিলোচনা,
হর লাগি হৈল তপস্বিনী।
ত্যজি মা বাপের কোল, না শুনিয়া কারো বোল।
পুণ্যারণ্যে রহে একাকিনী॥
নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় স্নান, ব্যাঘ্রাজিন পরিধান,
বিভূতি-ভূষণ বরতনু।
ভূষিতা রুদ্রাক্ষমালে অর্দ্ধ চন্দ্র ফোঁটা ভালে,
মৌনব্রত হয়ে ভাবে স্থাণু॥
যোগশাস্ত্র অনুসারে, সকলি ত্যজিয়া দূরে,
শীর্ণ পর্ণ রহিল আহার।
তাহা ত্যাগ হৈল যবে অপর্ণাখ্য হয়ে তবে,
পবন ভক্ষণ কৈল সার॥
শীতেতে আকণ্ঠ জলে, নিদাঘে পঞ্চাগ্নি জ্বলে,
বৃষ্টিকালে ভিজে অনুক্ষণ।
মুদিত করিয়া আঁখি, ঊর্দ্ধপদে ঊর্দ্ধমুখী,
ভাবে গৌরী ভবের চরণ॥
মহামন্ত্র জপে মনে, পণ করি ত্রিলোচনে,
লোচনে বহিছে প্রেমধারা।
ভনে দ্বিজ রামেশ্বর, চঞ্চল হইল হর,
চণ্ডীরে দেখিতে আইলা ত্বরা॥

শিবায়ন।

গৌরীর তপস্যা সম্বন্ধে কবিকঙ্কণের বর্ণনা—

তপস্যা করেন গৌরী হরপদ আশে।
আহার টুটান মাতা দিবসে দিবসে॥
এক পদে কৃতাঞ্জলি দিবস ক্ষেপণ।
মাঘমাসে নিশাকালে উদকে শয়ন॥
দিন এক উপবাস দিনেক ভোজন।
ত্যজিল তাম্বূল তৈল ভূষণ চন্দন॥
দুই উপবাস করি করিলা পারণা।
মহেশ স্বামী হেতু কৈল ধ্যান ধারণা॥
চিন্তিল শিবের পদ মুদিত লোচনে।
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেতে কৈল ব্রতের নিয়মে॥
পঞ্চতপ করেন জ্বালিয়া পঞ্চানলে।
ঊর্দ্ধমুখ দিয়া রৈল অরুণমণ্ডলে॥
কৈল ব্রত গিরিসুতা তিন উপবাস।
পারণা করিল শেষে সবে তিন গ্রাস॥
অন্ন ত্যজি খান মাতা কোপিত্থ বদর।
কত কাল পান কৈল কেবল পুষ্কর॥
বৃক্ষের গলিত পত্র করিল ভোজন।
শিবপদ ধ্যান গৌরী করে অনুক্ষণ॥
ত্যজিল বৃক্ষের পত্র ত্যজি অন্ন-পান।
এই হেতু অপর্ণা হইল অভিধান॥
ছলিতে আইলা হর দ্বিজ বেশধর।
জিজ্ঞাসিলেন শিব, গৌরী দিলেন উত্তর॥

হিন্দু শাস্ত্রের মতে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ তিনই পূর্ব্ব জন্ম হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। জন্ম হইলেই যেমন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, বিবাহও তদ্রূপ। তবে যে কাহার কাহার চিরকৌমার্য্য ঘটিয়া থাকে, আদৌ বিবাহ হয় না, তাহা অতি বিরল এবং তাহাও বিধিনির্দ্দিষ্ট। যদি তাহাই হয়, তবে আর তাহার জন্য এত বাড়াবাড়ি কেন—পাত্র পাত্রী যদি পূর্ব্ব হইতেই স্থিরীকৃত থাকে, তবে আর তপস্যাদির প্রয়োজন কেন—ইহা কেবল কর্ত্তব্য পালন বই আর কিছুই নয়। অদৃষ্টে যাহা আছে, অদৃষ্ট-বাদীকে তাহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মানিয়া লইতে হইলেও চেষ্টা ও যত্ন চাই। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকা চলে না, মন-স্তুপ্তির জন্য চেষ্টা ও যত্নের প্রয়োজন হয়, বিশেষতঃ অদৃষ্ট অজ্ঞাত—ভবিতব্যতার বিষয়ে কেহই নিশ্চিত হইতে পারে না, সুতরাং অভীপ্সিতের সিদ্ধি জন্য নানা উপায় দেখিতে হয়। তজ্জন্যই গৌরীর তপস্যা। তিনি আপনার ভবিতব্যতা অবগত ছিলেন না, অথচ তাঁহার ঐকান্তিকী কামনা শিবকে তিনি স্বামিরূপে প্রাপ্ত হয়েন।

হিন্দুর পতি-পত্নীত্ব দুই দিন, দশ দিন বা দুই এক বৎসরের জন্য নহে। হিন্দুর এই সম্বন্ধ জীবনে মরণে অবিচ্ছিন্ন। যাঁহাদের এ সম্বন্ধ চুক্তির দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, মনে করিলেই বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে, তাঁহারা যখন বিবাহসম্বন্ধ সংস্থাপনের পূর্ব্বে পতি পত্নীর মনোভাব যথাসম্ভব অবগত হইবার জন্য সচেষ্ট, তখন হিন্দুর তাহাতে নিবৃত্ত থাকা কখন সম্ভবপর নহে। তবে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের যতটা বাঁধা-বাঁধি আঁটাআঁটি, হিন্দুর ততটা নহে। দেবাদিদেব অলক্ষ্যজন্মা এবং স্থবির হইয়াও গৌরীর বরমাল্য লাভ সুকৃতিজনক না ভাবিয়া যখন তাঁহার পতিনিষ্ঠার পরীক্ষায় প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তখন তিনি অনায়াসলভ্য নহেন। তাঁহার বিলক্ষণ

দর ছিল. মনে করিলেই যে কেহ তাঁহাকে পতিরূপে পাইতে পারে না, তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছে।

গৌরীর একাগ্রতা পরীক্ষার জন্য মহাদেব স্বয়ং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া তপস্যানুরতা পার্ব্বতীর সম্মুখীন হইলেন, এবং নিম্নোক্ত প্রকারে শিবনিন্দা আরম্ভ করিলেন.—

কহ লো নিরুপমা, কাহার যোগে রামা
ইচ্ছিলা বুড়া জটাধরে।
হইয়া সুনারী, ভজহ ভিখারী,
দরিদ্র বর দিগম্বরে॥
কহ লো রূপবতী, দেহের হেম পুতি,
মাণিকরুচিরদশনা।
তৈল নাহি ঘরে, ইচ্ছিলে হেন বরে,
হইবে বিভূতিভূষণা॥
গলায় হাড়মাল, বসন বাঘছাল,
উত্তরী যার বিষধর।
প্রেত ভূত সঙ্গে, চিতাধূলি অঙ্গে,
ইচ্ছিলে কেন হেন বর॥
কাহার পুত্র হর, না জানি কোথা ঘর,
না দেখি ভাই বন্ধু জনে।
বরিয়া শূলপাণি, হইবে দুখিনী,
দারুণ দৈব কারণে॥
শুন লো চন্দ্রমুখি! তোমারে আমি দেখি,
রূপেতে ভুবনমোহিনী।
কতেক আছে বর, ভুবনে মনোহর,
ইচ্ছিলে বুড়া বর কেনি॥
দরিদ্র পতি যার, বিফল জন্ম তার,
দারিদ্র্যে গুণরাশি নাশে।
শুন লো গুণময়ি, তোমারে আমি কই,
দরিদ্রে কেহ না সম্ভাষে॥
থাকিয়া হরশিরে, ভিক্ষুকের ঘরে,
মিলিলা গঙ্গা রত্নাকরে।
শুন লো গুণময়ি! তোমারে হিত কই,
দরিদ্রে কেহ না আদরে॥

কবিকঙ্কণ।

ভারতচন্দ্র গৌরীর তপস্যা ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে শিবের গৌরী পরীক্ষা কিছুই বর্ণনা করেন নাই। তবে রামেশ্বর যেরূপ ঐ দুইটী বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।—

পশুপতি পাবো পতি পুষ্ট করি পুণ্য।
কেবল কঠোর তপ করি এই জন্য॥
হি হি করি হাসিল ব্রাহ্মণ ইহা শুনি।
বাসনা করেছ বিদগ্ধ জানি॥
সে শিবকে সমর্পিবে সোণা পারা দে।
হাতে তুলি বিষ খেতে বলে দিল কে॥
শিবের সংবাদ কিছু শুন নাই পারা।
বিকট বদন বড় বিপরীত ধারা॥
ভক্ষণ ভাঙ্গের গুঁড়া ভস্ম বিভূষণ।
সদাই শবের প্রায় শ্মশানে শয়ন॥
প্রেত ভূত প্রমথ পিশাচ লয়ে সঙ্গ।
গায়ের যোগীয়া গন্ধে যম দিল ভঙ্গ॥
বেড়ে সাপ গায় গলায় হাড়মালা।
জটায় জাহ্নবী যায় কুম্ভীরের বেলা॥
করে ব্রহ্মকপাল, কপালে দাবানল।
মদন মরিল পুড়ে হইয়া বিকল।
কোমলাঙ্গী কেমনে তিষ্ঠিবে তার কোলে।
জীবন্তে জ্বলিবে যেন জ্বলন্ত অনলে॥
শুনিতে সুন্দর শিব, সেবিতে সুন্দর।
দেখিতে সে দারুণ দরিদ্র দিগম্বর॥

গঙ্গাকে গৌরব করি ধরেছিল শিরে।
গড় করি গেল সেই রত্নাকরনীরে॥
লক্ষ্মীছাড়া ললাটে লাগিয়া শশধর।
অর্দ্ধভাবে অপূর্ণ আছেন দিগম্বর॥
দারিদ্র্য দোষের পর দোষ নাই আর।
সত্ত্বগুণ থাকিলে সকল যায় মার॥
নির্গুণ নিষ্কাম বাম—পথে অবস্থিতি।
কে জানে কি জাতি কার পুত্র কার নাতি॥
বুড়া কত কালের বলিতে নারে কেহ।
চলে যেতে চলে পড়ে অতি বৃদ্ধ দেহ॥
বড় বলি বাসনা করেছ বুড়া বরে।
ভিক্ষা মাগি খায় ভুঞ্জে ভাঙ্গ নাহি ঘরে॥
জ্বলিবে জঠরানল জীবে কতকাল।
এক মুখে পঞ্চমুখ বড়ই জঞ্জাল॥
কি দেখি পড়েছ ভুলে ভূপতির ঝি।
মোরে বল ভাল বরে আমি এজ্ঞা দি॥
কুমারী বলেন কিছু কন্যা নাঞি আর।
গড় করি গোসাঞি তোমাকে পরিহার॥
বুড়ালে ব্রাহ্মণকুলে ব্রহ্ম নাহি জান।
কহি কিছু কৃপা করি কাণ পাতি শুন॥

শিবায়ন।

ব্রাহ্মণবেশে গৌরীকে শিবের ছলনায় উভয় কবিই বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ছন্দ এবং পদবিন্যাস গুণে প্রথমোক্ত কবিতা বিলক্ষণ হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে। উভয়েই আদর্শ মহাকবি কালিদাস এবং কবিতা দুইটীই কালিদাসের কুমারসম্ভবের পার্ব্বতী-পরিণয়ের ছায়া। পতিপ্রাণা আদর্শ সতী গৌরীর প্রত্যুত্তর উভয়ত্রই সমান। তবে কবিকঙ্কণ অল্প কথায় সারিয়াছেন, আর রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিস্তৃতরূপে বলিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ ঠাকুর শুন, ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
শিবনাম করিলে সন্তাপ যায় দূর॥
কুশলার্থ কৃতার্থ করুণাময় নিধি।
ব্রহ্মবীজ বিশ্বনাথ বিধাতার বিধি॥
চন্দ্রচূড় বিনা চিরজীবী নহে কেহ।
কাল পেয়ে মরেন, ধরেন মত দেহ॥
শুদ্ধসত্ত্ব শিবমূর্ত্তি সদানন্দময়।
ঈশ্বর অজরামর অক্ষয় অব্যয়॥
শিবব্রহ্ম শিবব্রহ্ম শিবব্রহ্ম সার।
শিবসম সুখসেব্য সুরে নাহি আর॥
শিব হৈতে সকল, সকলে সদাশিব।
মায়াতে মোহিত হয়ে জানে নাই জীব॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে যত হয় রাজা।
সবাকার সম্পদে শিবের করি পূজা॥
রাজা রাম রাবণে বধিল যার বলে।
হেলায় বান্ধিল সেতু সমুদ্রের জলে॥
রামে বর দিয়া রামেশ্বর অভিধান।
তুষ্ট তূর্ণ অপূর্ণ কামের পূর্ণ কাম॥
ভীষ্মক ভূপের বেটী ভক্তি করি ভবে।
ভামিনী ভবনে বসি ভগবান্ লভে॥
বাণে বর দিয়া বাণেশ্বর অভিধান।
লোকগুরু কল্পতরু প্রভু ত্রিনয়ন॥
অমঙ্গলশীল কিন্তু মঙ্গলের মূল।
সেজন সুকৃতি শিব যারে অনুকূল॥
অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি আছে করতল।
শুভদাতা সদাশিব সেবকবৎসল॥
যোগেন্দ্র পুরুষ জন্ম জরা কৈল জয়।
তেঁই তাঁর দাসী হতে অভিলাষ হয়॥

শিবায়ন।

কবিকঙ্কণ এতটা বিস্তার না করিয়া অল্প কথায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেও গৌরীর মনোভাব বিলক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াছে।

অণিমা লঘিমা আদি যার অষ্ট সিদ্ধি।
যাহার ষোড়শ অংশ না ধরিল বিধি॥
ত্রিভুবনে দেখি যার পরম সম্পদ।
কেবা সেবা নাহি করে মহেশ্বর পদ॥
ত্রিভুবন রাখিলা করিয়া বিবগান।
মৃত্যুঞ্জয় বিনা বর কেবা আছে আন॥

গৌরীর উত্তর পাইয়া ছদ্মবেশধারী শিব গৌরীর দৃষ্টির উপরেই নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। অর্থাৎ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রত্যুত্তর দান সমাপ্ত হইবামাত্র পার্ব্বতী দেখিলেন, যে ব্রাহ্মণের সহিত তিনি কথোপকথন করিতেছিলেন, তিনি আর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নহেন, স্বয়ং শিব। কবিকঙ্কণ কিন্তু তাহা না করিয়া গৌরীকে কিয়ৎকালের জন্য স্থানান্তরিত করিয়া পরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের শিবমূর্ত্তি পরিগ্রহ বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ বলেন দেখা হবে দুয়ে একে।
তখন ত্রিপুরা তাঁকে ত্রিলোচন দেখে॥

শিবায়ন।

তপস্বীর দেখি কিছু চঞ্চল অন্তর।
সেই স্থান ছাড়ি গৌরী চলে অন্তর।
এমন সময়ে হর নিজ রূপ ধরি।
পার্ব্বতীর সম্মুখে রহিলা ত্রিপুরারী॥

কবিকঙ্কণ।

যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান, ইচ্ছামাত্র যিনি সুরনরকিন্নরাদি যে কোন মূর্ত্তি পরিগ্রহে সক্ষম, তাঁর ব্রাহ্মণবেশ পরিগ্রহ জন্য পার্ব্বতীর নয়নান্তরালের প্রয়োজন কি? এইখানেই প্রকৃত প্রস্তাবে হর-গৌরীর পরিণয় কার্য্য সমাধা পায়; পার্ব্বতী শিবগলে বরমাল্য অর্পণ করেন।

এই বিবাহ উৎসবে পরিণত করিবার জন্য সমুচিত আড়ম্বরের অনুষ্ঠান হয়। শুভদিন শুভক্ষণ দেখিয়া দেবগণ পশুপতি-পরিণয়ার্থে কৈলাসক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া মহা আড়ম্বরে বর লইয়া হিমাদ্রিশিখরে উপনীত হয়েন। তথায় হিমগিরিপতির দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া সকলেই বিবাহসভা পবিত্র করেন। দেবাদিদেব দেবকুল প্রথানুসারে পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণ করিলে দেবগণ পরমানন্দ লাভ করেন।

বিবাহস্থলে শিবের দিগম্বরমূর্ত্তি ধারণ উপলক্ষ্য করিয়া কবিকঙ্কণ, রামেশ্বর এবং ভারতচন্দ্র তিনজনেই একটা রহস্যের তুমুল তরঙ্গ তুলিয়াছেন। স্ত্রীচরিত্রের প্রবণতা প্রদর্শন জন্য মেনকাচরিত্রে প্রাকৃত ভাবের আরোপ করিয়াছেন—জামাতার দিগম্বর মূর্ত্তি দর্শনে তিনি ভীতা, চকিতা এবং কিয়ৎকালের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন। পরক্ষণেই জামাতার অপূর্ব্ব শ্রীসৌন্দর্য্য দর্শনে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন।

গৃহচিকিৎসা—পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

১। আঞ্জনীতে। আকন্দ গাছের আঠা, ডান চক্ষে হইলে বাম পায়ের অঙ্গুষ্ঠে এবং বাম চক্ষে হইলে ডান পায়ের অঙ্গুষ্ঠে দুই ফোঁটা লাগাইলে আঞ্জনী ফাটিয়া যাইবে।

২। চাতুর্থক জ্বরে অর্থাৎ ২ দিন অন্তর জ্বরে। জ্বরের দিবস প্রাতে শ্বেত অপরাজিতা ফুলের লতা, পুরুষের ডান হাতে এবং স্ত্রীলোকের বাম হাতে অনন্তের ন্যায় পরাইয়া দিলে আর জ্বর হইবে না।

৩। স্বপ্নচ্যুতিতে। প্রতি রোজ রাত্রিতে শয়নকালীন কাবাব চিনি চূর্ণ ৵০ আনা ও কাশীর চিনি ৵০ আনা একসঙ্গে সেবন করিলে উপকার হইবে।

৪। বাধকবেদনায় ঋতুর তিন দিন, প্রত্যহ চাটিম কলা গাছের শিকড়ের রস চিনি সহ একবার করিয়া সেবন করিলে ব্যথা নিবারণ হইবে।

৫। কার্ব্বঙ্কল প্রভৃতি স্ফোটকাদি রোগে নূতন অবস্থায় কংকচাঁপা ফুল কাঁচা দুগ্ধের সহিত বাটিয়া প্রলেপ কিম্বা পটী দিলে বসিয়া যাইবে।

৬। বিকঁচ অর্থাৎ কাউর ঘায়ে। নূতন ঝাউপাতা, বেতের ডগা, গুঁড়ি ঝচুর ডাটা সিদ্ধ করিয়া বাটিয়া এবং তদুপরি কদম পাতা বেষ্টন করিয়া বান্ধিয়া রাখিলে আরোগ্য হইবে।

৭। নেত্ররোগে। কবুতরের বিঠা মধু দ্বারা মাড়িয়া অঞ্জন দিবে।

৮। বাগীতে। কুক্কুটডিম্বের কুসুম ও মেটেসিঁদূর একত্র করিয়া নেকড়ায় মাখিয়া বাগীর উপর বসাইয়া দিলে বসিয়া যাইবে।

৯। সূতিকা রোগে, কমই গাছের মূল ১ তোলা বাটিয়া অপর মসলার সহিত ৭টী কৈ মাছের ঝোল করিয়া খাইবে। খই খাইতে যখন তিক্ত বোধ হইবে তখন বুঝিবে যে রোগ আর নাই।

নূতন সংবাদ।

১। নাগপুরে কতিপয় দুর্বৃত্ত তত্রত্য মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তি বিকৃত করিয়া দিয়াছিল। তথাকার অধিবাসিগণ এই দুর্বৃত্তদিগের নীচ কার্য্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন এবং একটী নূতন মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।

২। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মান্দ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ রায় বাহাদুর আনন্দ চার্লু দেহত্যাগ করিয়াছেন।

৩। শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষোন্নতি সভা আগামী বৎসরে দুইটী ১০০৲ টাকার, পাঁচটী ৫০৲ টাকার ও দশটী ২৫৲ টাকার বৃত্তি প্রদান করিবেন এবং জাপান, ইংলণ্ড ও আমেরিকা যাইবার জন্য কতকগুলি জাহাজ ভাড়া দেওয়া হইবে। ৩০ শে ডিসেম্বরের মধ্যে বৃত্তিপ্রার্থিগণকে উক্ত সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত-বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের নামে ৬নং ওল্ড্ পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটের ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

৪। পৃথিবীর সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের নৈতিক সাধন জন্য ও আর্থিক অবনতির কারণ দূর করিবার নিমিত্ত এক সভা সংস্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। রুষিয়ানিবাসী ইস্‌মাইল খাস ব্রিন্‌স্কি এই প্রস্তাব করিয়াছেন এবং এই সভার প্রথম অধিবেশন মিশর কাইরো নগরে হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

৫। বঙ্গীয় কারাগারসমূহে কতকগুলি দুর্ঘটনা ঘটায় কর্ত্তৃপক্ষগণ বাঙ্গালী জেলার ও ওয়ার্ডর্স পরিবর্ত্তন করিয়া সেই স্থানে ইংরাজ নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

৬। হিন্দুবালিকাদিগের শিক্ষার জন্য মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজ সহরে একটী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

৭। লক্ষ্ণৌ সহরে পার্দ্দানশীন মহিলাদিগকে কলা ও শিল্প বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য এক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। তত্রত্য ছোটলাটপত্নী লেডী হিউয়েট এই বিদ্যালয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন।

বামারচনা।

আশীর্ব্বাদ।

স্নেহের পুতুল তুই স্নেহ-পারাবার,
ত্রিদিবের সুখ শান্তি করি অবহেলা,
কেন এ কণ্টকাকীর্ণ ভব-কারাগার,
তার মাঝে? খেলিবারে? সমরখেলা!

অমরাবতীর শোভা! মন্দার কুসুম!
মন্দাকিনী-লহরীর সম নিরমল,
গোলাপের আভা তুই—কস্তুরী কঙ্কণ,
দেববালকের সম সুন্দর সরল।

নব কিশলয় সম কোমল বিমল,
কোকিলের কুহুতান সম স্নিগ্ধ তুই,
মকরন্দ ভরপুর নলিনীর দল;
সন্ধ্যার রজনী-গন্ধা প্রভাতের জুঁই।

আসিলি কি সবাকারে সুখী করিবারে,
কিম্বা দুদিনের তরে ফাঁকী দিতে শুধু,
চাহেনা পরাণ তোরে ভালবাসিবারে,
চাহেনা লভিতে তোর সরলতা মধু।

স্বরগের ভালবাসা মান অভিমান,
আদর সোহাগরাশি, পুণ্য পবিত্রতা
ওঁয়া ওঁয়া কান্না, হাসি সুধার সমান,
লয়ে আয়, বুকে আয় স্নেহমাখা লতা।

দেবতার আশীর্ব্বাদ লইয়ে মাথায়,
অতিথি! আইস গৃহে লয়ে সুমঙ্গল,
তোর স্পর্শে গৃহ তোর শান্তির আলয়,
শান্তিকণা! ঢাল বঙ্গে শান্তি সুবিমল।

সুরুচিবালা সেন।

বিষাদে।*

মরমের দীর্ঘশ্বাস,
পরাণের হা হুতাশ,
বুকভরা দুঃখোচ্ছ্বাস
কেহতো বোঝেনা হায়!
বহে তপ্ত অশ্রুজল,
শতধারে অবিরল,
ভেসে যায় হৃদিতল,
কেহ তো দেখেনা তায়।
কেহ তো বোঝেনা মোর,
প্রাণে কি বেদনা ঘোর,
কারো তো নয়নলোর,
ঝরেনাকো মোর তরে।
কেহ তো আসে না হেথা,
জানাইতে সব ব্যথা,
কহেনাকো দুটী কথা,
মোর সনে স্নেহভরে।
দারুণ সংসার পায়,
দলিত হইয়ে হায়!
হৃদয় টুটিয়ে যায়,
প্রাণ জ্বলে যাতনায়;
অনাদর অপমান,
বিষময় বাক্যবাণ,
করে হৃদি শতখান,
তবু বেঁচে আছি হায়!

সংসারের উপেক্ষায়,
সতত কম্পিত কায়,
ত্রাসে বুক ফেটে যায়
আকুল ব্যথিত প্রাণ।
শুধু তব আশে হরি!
তব পদ হৃদে ধরি,
তোমারে স্মরণ করি,
আছি আজো ভগবান্!

যেন দেব এই ভাবে, লাঞ্ছনা গঞ্জনা সয়ে;
জীবন কাটিয়া যায় কর্ত্তব্য মাথায় লয়ে।

---

* কোন উৎপীড়িতা বিধবার আক্ষেপ।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।